আশ্চর্য মাকড়শা ও মায়া-মসলিন

শেখর বসু

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

প্রচ্ছদ সুধীর মৈত্র

মুদ্রক
দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
অজিত কুমার দত্ত
৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

শ্রীমতী শেফালী বিশ্বাস

শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু

আশ্চর্য মাকড়শা ও মায়া-মসলিন

মধ্য প্রদেশের তিতোরিয়া নামেই, আধা-শহর, আসলে এটি একটি গণ্ডগ্রাম। গাড়ি থেকে মাটিতে পা দেবার আগেই অনুপ বুঝতে পারল ওদের কোম্পানির ব্যবসা এখানে চলবে না। হেডঅফিস ভুল খবর পেয়ে ওকে জায়গা দেখতে পাঠিয়েছে। এখানে দুদিন থাকার কথা ছিল, কিন্তু দু-মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গেল ওর। এমনকি হেডঅফিসে কী রিপোর্ট দেবে সেই বয়ানটাও ওর মাথায় মধ্যে ঘুরছিল।

গাড়ি থেকে নেমে আড়ামোড়া ভেঙে সিগারেট ধরাল অনুপ। দূরত্বের হিসেবে এ-জায়গাটা হয়ত তত দূরে নয়, কিন্তু এখানে আসতে ধকল গেছে বেশ। ট্রেন জার্নি, তারপর ভাড়া-গাড়িতে বিদ্ঘুটে রাস্তায় লাফিয়ে লাফিয়ে এতটা আসা!

সিগারেটে গোটাকয়েক লম্বা টান মেরে অনুপ গাড়ির ড্রাইভারকে বলল, 'জারা রোকিয়ে'। গাড়িটা এক্ষুনি-এক্ষুনি ছেড়ে দিতে ও ভরসা পাচ্ছিল না। কোনো কারণে ওদের এজেন্ট মতিরাম যদি এসে পৌঁছতে না পারে, এই গাড়িতেই ও আবার স্টেশনে ফিরে যাবে!

মতিরাম একটা কাগজে ম্যাপ এঁকে এই তিন রাস্তার মোড়ের বর্ণনা দিয়েছিল। কাগজটা পকেট থেকে বার করে অনুপ বর্ণনাটা মিলিয়ে নিল আবার। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, এমনকি খুঁটির মাথায় দোমড়ানো ওই ফলকটাও দেখা যাচ্ছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ও ফলকটার কাছে। রোদে পোড়া, জলে ভেজা অক্ষরগুলো উদ্ধার করতে বেশ কষ্ট হয়। তবে সূত্র ছিল বলেই ও ধরতে পারল, এককালে এখানে গোটা-গোটা হরফে 'তিতোরিয়া' লেখা ছিল।

তিতোরিয়ার মানে অনুপ জানে না, কিন্তু ঝাপসা ওই হরফগুলোর মধ্যে কী এক রহস্য যেন আছে! চারদিকের ঠাসা গাছ-গাছালির মধ্যে বিচিত্র এক চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল টিনের ফলকটা।

একটু পরে সাইকেল চেপে হাজির হল এজেন্ট মতিরাম। এসেই দেরি করে আসার জন্যে নানাভাবে ক্ষমা চাইল। অনুপ ওর কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আরে দেরি কোথায় হল, আমি তো এইমাত্র এসেছি।'

ভাড়া মিটিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল অনুপ।

মতিরাম হাতজোড় করে বলল, 'চলেন সাব্ আগে আমার কোঠিতে, একটু নাস্তাপানি করে নেবেন, তারপর —।'

অনুপ ওকে থামিয়ে দিল। 'আমার নাস্তাপানি হয়ে গেছে, চলো আগে সাইটটা দেখে আসি।' মনে মনে বলল, সাইট দেখে ঘোড়ার ডিম হবে। এখানে এসে ব্যবসা করতে গেলে লাটে উঠে যাবে কোম্পানি। আমার রিপোর্ট তৈরি। মোদ্দা কথা—নট ফিজিবল্।

শীতের সকালের চমৎকার রোদ্দুরে গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটতে কিন্তু বেশ ভালই লাগছিল অনুপের। কাছেই সাইট, খুব খুঁটিয়ে দেখার ভান করে মার্কামারা কয়েকটা প্রশ্ন করল অনুপ। খুব আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিল মতিরাম। উত্তর দেবার পরেও অনেক কথা বলে গেল গড়গড় করে। এবার একটু এজেন্টের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে সাহেবকে। না গেলেই নয়, এটা প্রায় রেওয়াজের মধ্যে পড়ে গেছে। ওর বাড়ির দিকে যাবার পথে গাছপালা আরো সবুজ আরো ঠাসা হয়ে উঠেছিল।

অনুপ কাজের সূত্রে কোথাও গেলে কাছাকাছি দর্শনীয় জায়গাগুলোও দেখে নেয়। সেই অভ্যাস থেকে ও বলল, 'মতিরাম, তিতোরিয়া জায়গাটা তো বেশ। তা, তোমাদের এখানে দেখার কিছু নেই?'

মতিরাম আকাশ থেকে পড়ে বলল, 'এখানে আর কী দেখবেন সাব্! জংলি জায়গা, চারদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।'

অনুপ হাসতে হাসতে বলল, 'জঙ্গলই দেখব।'

মতিরাম অনুপের কথা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না প্রথমে, কিন্তু বিশ্বাস করার পরেই ব্যবস্থা করে দিল দ্রুত।

খাবারদাবারের যোগাড় করতে হবে বলে মতিরাম আর অনুপের সঙ্গে জঙ্গলে গেল না। তবে বারবার সাবধান করে দিয়ে বলল, 'বেশি ভেতরে যাবেন না। ভেতরের জঙ্গলে শের আছে, ভালু আছে।'

গাইড একজন সবল তিতোরিয়াবাসী। তার বিশাল চেহারা আর হাতের চকচকে টাঙ্গি দেখে অনুপের বাঘ-ভাল্লুকের ভয় কমল সামান্য। সঙ্গীটি বেশ হাসিখুশি, কিন্তু একসঙ্গে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে দেখা গেল কেউ কারো ভাষা একবর্ণও বোঝে না। তার ফলে যে যার মতো কথা বলে যাচ্ছিল, মাঝেমধ্যে একসঙ্গেও কথা বলছিল অনর্গল।

জঙ্গলে জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই দেখার ছিল না। কিছুক্ষণ জঙ্গল দেখার পরে ক্লান্ত হয়ে গেল অনুপ। ফেরার মুখে দুটো বেজি চোখে পড়ল। বেজি-দুটো ওদের দেখে নিয়ে তিন লাফে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। ধোঁয়া দেখে আগুনের কথা সব সময় মনে আসে না, কিন্তু এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে বেজি দেখেই সাপের কথা মনে পড়ে গেল অনুপের। চারদিকে ভাল করে দেখে-শুনে

লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল।

এইভাবে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে থমকে গেল অনুপ। আরে! এ তো সেই গল্পে শোনা মসলিন! মসলিন ছড়িয়ে আছে সামনের লিচু গাছের এক ডাল থেকে আর এক ডাল পর্যন্ত। অলৌকিক কান্ড! কী সূক্ষ্ম কাপড়। সোনালি সুতো অসম্ভব সরু অথচ বেশ শক্ত। একটু পরেই অনুপ দেখতে পেল মসলিনের এক ধারে বসে আছে প্রকান্ড এক মাকড়শা।

সামান্য মাকড়শার জাল দেখে অনুপকে এত মুগ্ধ হতে দেখে ওর সঙ্গীটি বোধহয় বেশ মজা পাচ্ছিল। জালটা যে সত্যিই তারিফ করার মতো অনুপ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল নানা ভাবে। কিন্তু লোকটা সম্পূর্ণ উলটো বুঝলো।

হাতের টাঙ্গি মাটিতে নামিয়ে রেখে লোকটা বুনো পাতা দিয়ে বিরাট এক ঠোঙা বানাল। তারপর একটা শুকনো ডাল দিয়ে খোঁচা মেরে মাকড়শাটাকে নীচে ফেলে ঠোঙার মধ্যে পুরে ফেলল চটপট। লোকটার কী মতলব অনুপ বুঝতে পারছিল না। কিন্তু একটু পরেই লোকটা চোখেমুখে বাহাদুরির ভাব ফুটিয়ে ঠোঙাটা এগিয়ে দিল ওর দিকে। দিতেই অনুপ ছিটকে সরে গিয়ে বলল, 'বাব্ বাবা! এই বুঝি শেষে।'

দূরে দাঁড়িয়ে অনুপ হাত মুখ ঘুরিয়ে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল, আমার মাকড়শা চাই না, এক্ষুনি ওটা ফেলে দাও।

কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না লোকটা। হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল অনুপ। লোকটা ঠোঙা হাতে নিয়ে ওর পিছু-পিছু মতিরামের ডেরায় এসে হাজির হল।

এইরকম একটা পান্ডববর্জিত জায়গায় মতিরাম কী করে এত খাবারদাবার আয়োজন করেছে, ভাবাই যায় না! খেতে বসে অবাক হয়ে অনুপ বলল, আলাদীনের প্রদীপট্রদিপ পেয়েছ না কি মতিরাম?'

মতিরাম হাতজোড় করে বলল, 'না-না, এ তো সামান্য আয়োজন, আপনি আরাম করে ভোজন করুন।'

অনুপ মতিরামকেও বসে পড়ার জন্যে জোর করল, কিন্তু মতিরাম পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি মেহমান, আপনি আগে ভোজন না করলে কি আমরা খেতে বসতে পারি।'

অনুপের বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল, তার ওপর মুখের সামনে এত সুখাদ্য, হাত গুটিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। না-না করে খেলেও একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেল ওর। এত বড় একটা ভোজনের পরে এবার একটু বিশ্রাম দরকার।

উঠোনের চারপাইতে বসে নিমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল

অনুপ। মতিরামের সেই জোড়াহাতটা আর খোলেনি। হাতজোড় করেই ও সাইটের গুণাগুণ বর্ণনা করে যাচ্ছিল একনাগাড়ে।

অনুপ হুঁ-হ্যাঁ করতে করতে শুনছিল। সব কথা কানে নিচ্ছিল না বলে বেজায়গায় সায় দিয়ে ফেলছিল মাঝেমধ্যে। কিন্তু ভুল টের পেলেও ও গুরু-ভোজনের কারণে নিজেকে আর সংশোধন করছিল না।

মতিরামের সাইটে কোম্পানি যদি ব্যবসা ফাঁদে, মতিরামের ভাগ্যের চাকা ওপর দিকে উঠবে ঠিকই, কিন্তু কোম্পানি ডুববেই। অন্যান্য ঝামেলা তো আছেই, শুধু ট্রান্সপোর্টেশনের খরচেই ঘায়েল হয়ে যাবে কোম্পানি।

মাঝেমধ্যে ওর বক্তৃতার সমর্থন চাইছিল মতিরাম। তর্কের মধ্যে না ঢুকে একপাশে মাথা কাত করছিল অনুপ। তারপর রোদ একটু পড়ে এলে বলল, ‘এবার ফিরতে হবে মতিরাম, আটটার ট্রেনটা ধরব।’

মতিরাম অনেকক্ষণ পরে জোড়াহাত খুলে দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘কোই ফিক্‌র নেহি, আপনি আরাম করুন।’

গাড়ির ব্যবস্থা করাই ছিল আগে থেকে। মতিরাম আর সেই জঙ্গলের গাইড ঠিক সময়ে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল অনুপকে। জানলার ধারে সীট! প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে মতিরাম শেষবারের মতো অনুপকে বোঝাল, ওই সাইটে কারবার করলে কী বিরাট ফায়দা উঠবে। ট্রেন ছাড়লে মতিরাম রাম-রাম বলে আর একবার হাতজোড় করল। উত্তরে হাত নাড়ল অনুপ।

দুলকি চালে কয়েক মুহূর্ত যাবার পরে মেল-ট্রেন ছুটতে শুরু করল ঠিক মেল-ট্রেনের মতো। একটা সিগারেট ধরাল অনুপ, আর তার পরেই ওর চোখ পড়ল স্যুটকেসের ওপরে। স্যুটকেসের হ্যান্ডেলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই ঠোঙাটা। পরিষ্কার বুঝতে পারল, এটা ওই জংলি লোকটার কীর্তি। লোকটা নির্ঘাত ভেবেছে, মাকড়শাটা খুব মনে ধরে গেছে সাহেবের। তাই এই উপহার।

ঠোঙাটা জানলা গলিয়ে ফেলে দেবে বলে দড়িটা খুলতে গেল অনুপ, কিন্তু পারল না। মহামূল্যবান বস্তু তো! সুতরাং শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। দড়ির বাঁধন খুলতে না পেরে উজবুক লোকটার ওপর খুব রাগ হয়ে গেল অনুপের।

কামরায় লোকজন বিশেষ নেই। চলন্ত ট্রেনের দুদিকে অচেনা প্রকৃতি। লাল-কালোয় মেশানো মাটি আর দূরে পাহাড় ও জঙ্গল। জঙ্গল দেখেই অনুপের তিতোরিয়ার জঙ্গলের কথা মনে পড়ে গেল। তারপরেই মনে পড়ল প্রকান্ড ওই মাকড়শাটার কথা। অত বড় মাকড়শা ও আগে কখনো দেখেনি। সেই মাকড়শাটা এখন আবার ওর সামনে, ওই শালপাতার ঠোঙার মধ্যে।

একটা কৌতূহল অনুপের মধ্যে বেড়ে উঠতেই ও শালপাতার ঠোঙাটা ফাঁক করল আস্তে আস্তে। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র এক অনুভূতি হল ওর। মাকড়শাটা জ্বল-জ্বল করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওই দৃষ্টিতে অনুপের সারা শরীরে

বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেন জানে না মনে হল, মাকড়শাটা কী যেন বলতে চায় ওকে। এরকম মনে হওয়া অদ্ভুত, কিন্তু অদ্ভুত ধারণাটা অনুপের মাথায় শিকড় ছড়িয়ে ফেলল আস্তে আস্তে। ঠোঙার মুখটা বন্ধ করে সঁটে এসে বসল ও।

ট্রেনে বিশেষ ঘুম হল না অনুপের। হঠাৎ-হঠাৎ ওর মাথার মধ্যে উদ্ভট সব চিন্তাভাবনা খেলে যাচ্ছিল। পুরনো খবরের কাগজ আর নতুন বই পড়ে সময় কাটাল কোনোরকমে। দু-প্যাকেট সিগারেটের জায়গায় তিন প্যাকেট উড়ে গেল দেখতে দেখতে।

বাড়ি ফিরেই অনুপের প্রথম কাজ হল মাকড়শার জন্যে একটা জায়গা ঠিক করে ফেলা। কোথায় রাখা যায় এটাকে? পাখি হলে খাঁচা, খরগোশ হলে প্যাকিং-বক্স, কুকুর হলে যত্রতত্র, কিন্তু মাকড়শা! কোথায় রাখা যায়? এক-একবার ভাবছিল, ও কী পাগলামো করছে! তবে নিজের পাগলামো ধরতে পারলেও তার হাত থেকে ওর বোধহয় এখন আর উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে একটা হরলিকসের খালি শিশির মধ্যে রেখে দিল অতিথিকে।

কিন্তু কী খাবে অতিথি? এবারও বেশ মাথা খাটাতে হল অনুপকে। তারপর ও বিস্কুটের গুঁড়ো, পাউরুটির টুকরো, চিনি আর কিছুটা দুধ রেখে দিল শিশিতে। এত আয়োজন অথচ কিছুই খেল না মাকড়শা। দিন-তিনেক বাদে অনুপ দেখল, মাকড়শা বেশ নির্জীব হয়ে পড়েছে। আগের মতো আর জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছেও না।

এ ভাবে আর দুচারদিন থাকলে মরে যেতে পারে মাকড়শাটা। কী দরকার শুধু শুধু প্রাণীহত্যা করে! পাগলামো ঢের হয়েছে, এবার এটাকে ছেড়ে দেওয়া যাক। কাছাকাছি জঙ্গল থাকলে ও জঙ্গলেই ছেড়ে দিয়ে আসত মাকড়শা-টাকে, কিন্তু জঙ্গল কোথায় এখানে? আচ্ছা, জঙ্গলের বদলে ঘরের দেয়াল হলে কেমন হয়? ছোটখাটো মাকড়শাগুলো তো দিব্যি দেয়াল চষে বেড়ায়।

একটু ইতস্তত করে দেয়ালের কাছে গিয়ে শিশির মুখটা খুলে দিল অনুপ। মাকড়শাটা একটু নড়াচড়া করল, ঠিক সেই আগের মতো জ্বলজ্বল করে তাকাল অনুপের দিকে, তারপরে একলাফে উঠে গেল দেয়ালে। দেয়াল থেকে দ্রুত-গতিতে সিলিংয়ে। কালো কুচকুচে মাকড়শাটাকে এখন আবার আগের মতো প্রকান্ড দেখাচ্ছিল। সিলিং থেকে অনুপের দিকে চাইল একবার। বেশ খুশি-খুশি চাউনি। খুশি মনে অফিসে গেল অনুপ।

কিন্তু, অফিস থেকে ফিরে এসে মাকড়শাটাকে ও কোথাও দেখতে পেল না। না দেয়ালে, না সিলিংয়ে, না আলমারির পেছনে, না খাটের পাশে, না সোফার গদিতে। দেখতে না পেয়ে ওর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই মন খারাপ নিয়েই কেটে গেল দুদিন।

।। দুই ।।

তৃতীয় রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অনুপের। এখন বোধহয় মাঝরাত, চারদিক থমথম করছে। ছোট্ট একটা নীল আলো জ্বালিয়ে ঘুমনো অভ্যাস ওর। সেই আলোয় বিচিত্র একটা দৃশ্য দেখতে পেল অনুপ। মশারির মধ্যে আর একটা মশারি। জানলা দিয়ে বিছানার ওপরে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। চাঁদের আলো আর ঘরের নীল আলোয় অদ্ভুত একটা মিশেল তৈরি হয়েছে। সেই আলোয় চোখ সইয়ে নিয়ে অনুপ আবার দেখল, মশারির মধ্যে সোনালি সুতোর তৈরি আর একটা ফিনফিনে মশারি। মশারিটা কেমন যেন গোল হয়ে ওর গায়ের ওপর নেমে এসেছে। সরাতে গিয়ে দেখল ছোট মশারিটার ধারগুলো ওর গায়ের সঙ্গে জোড়া। এবার ও একটু ভয় পেয়ে গেল। তারপরেই দেখল প্রকাণ্ড সেই মাকড়শাটা সোনালি মশারিতে বারকয় চক্কর মেরে ওর মাথা থেকে হাত-দেড়েক ওপরে সুতোর জালের ওপর পা ছড়িয়ে বসল।

অ্যাদ্দিন পরে মাকড়শাটাকে ফিরে পেয়ে অনুপের খুব ভাল লাগছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও করছিল একটু-আধটু। মাকড়শা যদি এবার শোধ তোলে, জঙ্গল থেকে ধরে আনার শোধ। আরে! মাকড়শাটা কি হাসছে!

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কিন্তু সত্যিই ও হাসছে। হাসার জন্যেই বোধহয় ওর বড়-বড় চোখদুটোর চারদিকের চামড়া কুঁচকে গিয়েছিল। হাসি দেখেও অনুপ আশ্বস্ত হতে পারছিল না। মৃদু গলায় বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।'

মাকড়শা দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল, একটা বর্ণও বোঝা গেল না। থতমত খেয়ে অনুপ বলল, 'আপনি বাংলা জানেন না? ইংরেজি? হিন্দি?'

উত্তরে মাকড়শা হাসল। তারপর সোনালি মশারিতে দ্রুত কয়েক চক্কর মেরে এসে বলল, 'জানি, সব জানি। তবে তোমাকে আমার ভাষা শিখতে হবে।'

'শিখব, নিশ্চয়ই শিখব। বিদেশী ভাষা শিখতে আমার খুব ভাল লাগে।' কেমন যেন মন জুগিয়ে কথা বলার ভঙ্গিতে বলল অনুপ।

শুনে মাকড়শা আবার সেই দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ।

কয়েক মুহূর্ত পরে মিটিমিটি হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। মাকড়শা এবার বাংলায় কথা বলল: এতক্ষণ ধরে যা-যা ঘটেছে সব বলল এক এক করে। এক্সপেরিমেন্ট সফল। তার মানে ভবিষ্যতে অকল্পনীয় সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধি শুধু দু-পাঁচজনের নয়, সারা দেশের সমৃদ্ধি।

সব শুনে প্রচণ্ড উত্তেজনায় অনুপের সারা শরীরের রক্ত উঠে এল মাথায়। একটু খুঁতখুঁতি অবশ্য ও কাটাতে পারছিল না কিছুতেই। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা এতে মানুষের শরীরের কোনো ক্ষতি হবে না তো?'

ওর আশংকা দেখে মাকড়শা হেসে উঠে বলল, 'মোটেই না, বরং ভাল হবে। শরীরে একবিন্দু বাড়তি চর্বি জমবে না কখনোই। তাতে শরীর ভাল থাকবে, কর্মক্ষমতা বাড়বে। এই দেখ না তোমার চর্বি থেকে কত সুতো কেটেছি, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ? অসুস্থ বোধ করছ ?'

অনুপ হাত দিয়ে নিজের পেট আর কোমর দেখল। ভুল করে দুটো সিঁড়ি টপকালে যেমন হয়, ঠিক সেই ধরনের অভিজ্ঞতা হল ওর। অভ্যাসমতো হাত কিছুটা গিয়ে নীচে পড়ল ধপ্ করে। ওর শরীরের কোথাও একটুও বাড়তি চর্বি নেই। গালে হাত দিয়ে আর একবার অবাক হল অনুপ। আরে! কোথায় গেল ওর সেই দুথাক থুতনি!

শরীরটা অসম্ভব হালকা। মনের আনন্দে সেই ছেলেবেলার মতো কিছুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ল অনুপ। সোনালি সুতোর ছোট্ট মশারিটা ছিঁড়ে গিয়ে ওর সারা গায়ে জড়িয়ে গেল। মনের আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠে অনুপ বলল, 'আমি রাজি।'

মাকড়শা বলল, 'তাহলে আমার প্ল্যানটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি। বড় আলো জ্বালো, কাগজ-কলম দাও।'

অনুপ লাফিয়ে উঠে আলো জেলে কাগজ-কলম এনে দিল মাকড়শাকে। মাকড়শা একটু দূরে বসে বিস্তর অংক কষে কাগজটা এগিয়ে দিল অনুপের দিকে।

মাকড়শার হাতের লেখাটা অদ্ভুত ধরনের, তারপর পাতাজোড়া কঠিন-কঠিন সব অংক। অনুপ গম্ভীর মুখে পাতায় চোখ বোলাতে লাগল, কিন্তু কিছুই ওর মাথায় ঢুকল না।

মাকড়শা বলল, 'এই ব্যবসায় শুধু গ্রস ন্যাশনাল প্রডাক্টই নয়, এন এন পির হারও হবে অকল্পনীয়। ন্যাশনাল ইনকাম তো বটেই, পার ক্যাপিটা ইনকামও বেড়ে যাবে মাত্রাতীত। মানি ইনকাম আর রিয়েল ইনকামে আমাদের ধারে-কাছে অন্য কোনো দেশ আসতে পারবে না।'

মাকড়শার কথায় অনুপ শুধু এটুকু বুঝল, এ ব্যবসায় কল্পনাতীত লাভ। হিসেবের কাগজের দিকে চোখ রেখে ও বলল, 'তাহলে এখন কী করা দরকার ?'

মাকড়শা আরো গম্ভীর হয়ে বলল, 'প্রথমে কিছু মোটা লোক যোগাড় করে বাড়িতে নিয়ে এসো।'

'মোটা লোক কেন ?'

মাকড়শা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'নিয়েই এসো না, তারপর জানতে পারবে।'

অনুপ বুঝতে পারল, মাকড়শা অনাবশ্যক কৌতূহল পছন্দ করে না। আর কোনো প্রশ্ন না করে চুপ করে গেল ও। বাইরে মাঝরাত। ঘরের মধ্যে ঝকঝকে

নিয়নের আলো। সাদা পাশবালিশের ওপর মাকড়শা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল। ওর মেটে রঙের আটটা রোমশ পা নড়ছিল আস্তে আস্তে। গায়ে খয়েরি আর ব্রাউন রঙের ছিটে।

অনুপ হঠাৎ বলে বসল, 'আপনার বোধহয় তিতোরিয়ার ওই জঙ্গলের জন্যে মন কেমন করছে, না ?'

মাকড়শা হেসে বলল, 'আমাদের তো তোমাদের মতো মার্কামারা একটা-দুটো বাড়ি-ঘর থাকে না। আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াই ক্রমাগত। তিতোরিয়ায় আসার কিছুদিন আগেই আমি অন্য একটা জঙ্গলে ছিলাম। সুতরাং আস্তানা পাল্টাবার জন্যে আমাদের মন কেমন করে না।'

এত গোছানো উত্তর পেয়ে অনুপ প্রথমে দমে গেল, তারপর সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'কিন্তু গাছের ডালে থাকা আর বাড়ির দেয়ালে থাকার মধ্যে তফাত আছে তো, আপনার এই ঘরের মধ্যে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না ?'

'ঘরের মধ্যে সব সময় থাকি না তো।'

'তাহলে কোথায় থাকেন ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল অনুপ।

মাকড়শা ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, 'আমরা ছোটখাটো প্রাণী। না বলে দিলে আমাদের আস্তানা তোমাদের চোখে পড়ার কথা নয়।'

'না-না এ কী বলছেন !' অনুপ বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ল।

মাকড়শা একটু থেমে বলল, 'তোমাদের বাড়ির লাগোয়া জামগাছটা নিশ্চয়ই দেখেছ, ওই গাছের ডালেই আমি জাল পেতেছি।'

'জাল ! কেন ?'

'খেতে হবে না ? আমরা তো আর বিস্কুট, চিনি আর দুধ খাই না।'

অনুপের মনে পড়ে গেল, এইসব খাবারই ও মাকড়শাকে খেতে দিয়েছিল প্রথম দিন, কিন্তু মাকড়শা কিছুই ছুঁয়ে দেখেনি। মনে পড়তেই ও বলল, 'ও, আপনারা তো পোকামাকড খান।' কিন্তু কথাটা মুখ থেকে বার হতেই খারাপ লাগল অনুপের। পোকামাকড় খাওয়ার কথাটা এ-ভাবে না বললেই বোধহয় ভাল হত !

মাকড়শা অসন্তুষ্ট হল কি না বোঝা গেল না, তবে একটু ঘোরানো উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, যার যা খাবার।'

বাচ্চাদের মতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল অনুপ। 'আপনারা কি দূরে বসে লক্ষ্য রাখেন জালে কখন শিকার পড়বে ?'

মাকড়শা এবার হেসে ওঠে। 'আমাদের দেখার দরকার হয় না, জালে কাঁপুনি উঠলেই বুঝতে পারি। তাছাড়া খাবার যোগাড় করার ব্যাপারে আমার খাটুনি এখন কমে গেছে, জামগাছে আমি একজন বান্ধবী পেয়ে গেছি।'

শুনেই আঁতকে উঠে অনুপ বলল, 'নুনা বান্ধবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না, আপনি জামগাছ ছেড়ে দিন।'

গোল-গোল চোখদুটো উঁচুর দিকে ঠেলে দিয়ে মাকড়শা জিজ্ঞেস করল, 'কেন ?'

'কেন ! আপনি এত জানেন আর এটা জানেন না ?'

'কী ?'

অনুপ আরো উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'সত্যি জানেন না। সবাই জানে যে ···।'

'কী জানে ?'

'মেয়ে-মাকড়শা মিলনের পরে পুরুষ-মাকড়শাকে মেরে ফেলে।'

শুনে মাকড়শা রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি, আমি আন্দাজ করেছিলাম যে তুমি এই কথাটাই বলবে। আশ্চর্য ! এই ভুই ধারণাটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ কিছুদিন আগে একজন ব্রিটিশ মাকড়শা-বিশেষজ্ঞ এই ধারণাটা ভুল প্রমাণ করেছেন। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে উলটো কথা জানা গেছে। আসলে আবহাওয়া খুব খারাপ হলে কিছু-কিছু পুরুষ-মাকড়শা জাল বোনা ছেড়ে দিয়ে সঙ্গিনীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এইসব সঙ্গিনীর সঙ্গে যখন তাদের প্রেম চলে তখন তারা বেকার। ফলে প্রায়ই তারা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত আর অবসন্ন থাকে। কোনো কোনোপুরুষ মাকড়শা সেই সময় ধকল সামলাতে না পেরে মারা যায়। তাই দেখে মানুষরা ওই উদ্ভট সিদ্ধান্তে পেঁাছে গেছে।'

অনুপ লজ্জা পেয়ে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি নেহাতই একটা শোনা কথা উগরে দিয়েছি। আসলে আপনার ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমি এত ভাবি যে ···।'

মাকড়শার রাগ এখনো পড়েনি, একটু থেমে খসখসে গলায় বলল, 'তোমার ওই কথাটা কিন্তু তোমাদের মানুষের সমাজ সম্পর্কে দিব্যি খেটে যায়। কোনো মেয়ে ছেলেকে দেহ দিলে সুদে-আসলে শোধ তুলে নেয়। ওই মেয়েটার হাতে তখন ওই ছেলেটার শারীরিক কিংবা মানসিক মৃত্যু অবধারিত।

প্রসঙ্গটা হঠাৎই এমন একটা বেয়াড়া বাঁক নিয়ে বসল যে, অনুপ আর কথা খুঁজে পেল না।

মাকড়শা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পরে মশারির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে গম্ভীর ভাবে বলল, 'আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো, অনেক রাত্তির হয়ে গেছে।'

বাধ্য ছেলের মতো অনুপ মাকড়শার কথা শুনল।

॥ তিন ॥

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই অনুপের মনে হল, রাত্তিরে উদ্ভট একটা স্বপ্ন দেখেছে ও। কিন্তু স্বপ্ন কি এত সত্যির মতো হতে পারে? সবকিছু কী স্পষ্ট মনে পড়ছে, প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত। আরো কিছুক্ষণ গড়াবার পরে বিছানা ছাড়তে গিয়ে চমকে উঠল অনুপ। এ কি! শরীরটা এত হাল্কা পালকের মতো হয়ে গেল কী করে? তাহলে রাত্তিরের ওই ঘটনাগুলো তো স্বপ্ন নয়! ওর শরীরের চর্বি থেকে বানানো মসলিনের মতো কাপড়ের কয়েকটা টুকরো পড়ে ছিল বিছানায়। সেগুলো হাতে নিতেই রোমাঞ্চ হল অনুপের।

একলাফে খাট থেকে নেমে পড়ল অনুপ। দেয়াল, সিলিং আর আলমারির ফাঁকে মাকড়শাকে খুঁজল, কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না। কোথায় গেল? একদৌড়ে ছাতে উঠল ও।

কার্নিশের ধারে গিয়ে ঝুঁকতেই দেখতে পেল, জামগাছের ডালে অসামান্য সোনালি সুতোর জাল। শিশিরের বিন্দুগুলো মুক্তোর মতো ঝলমল করছে ওই জালে। কিন্তু মাকড়শা কোথায় গেল? শিকারের আশায় কি কোনো পাতার আড়ালে বসে আছে? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও মাকড়শাকে দেখতে না পেয়ে নীচে নেমে এল অনুপ। তারপর অফিসে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিল। অফিস ওর বাড়ি থেকে অনেক দূরে, একটু তাড়াতাড়ি বার না হলে ঠিক সময়ে পৌঁছনো যায় না।

চটপট তৈরি হয়ে নিল অনুপ, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াতেই ওর গা-হাত-পা শিরশির করে উঠল। মনে হল, বহু বছরের পুরনো কোনো অ্যালবামে নিজের ছবি দেখছে। মেদহীন, টানটান শরীর।

অফিসের পথে বেশ কিছুটা যাবার পরে বিচিত্র এক ভাবনা খেলে গেল অনুপের মাথায়। সহকর্মীরা ওকে দেখলে নির্ঘাত চমকে উঠবে। একদিনের মধ্যে কারো চেহারা এতখানি পালটে যেতে পারে না। কোনো কৈফিয়তই ওরা স্বাভাবিক ভাবে নেবে না, নেওয়া সম্ভবও নয়। কৌতূহল থেকে আসল রহস্য ফাঁস হয়ে গেলেই কেলেঙ্কারি। অনুপ এই প্রথম টের পেল, রাতারাতি বিশাল ধনী হবার আকাঙ্ক্ষাটা কী তীব্র হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে!

মাঝপথে মিনিবাস থেকে নেমে পড়ল ও। শুধু আজ বলেই নয়, আরো দিন-সাতেক অসুখের অজুহাতে ডুব মারতে হবে অফিস থেকে।

আগেই ও ঠিক করে রেখেছিল, অফিস থেকে বেরিয়ে তিন পুরনো বন্ধুর বাড়িতে হানা দেবে। তিনজনেই অসম্ভব মোটা আর পেটুক। খাবার নেমন্তন্ন করলে ঠিক চলে আসবে বাড়িতে। কিন্তু এখন তো ওদের বাড়িতে পাওয়া যাবে না, যে-যার কাজে-কর্মে বেরিয়ে গেছে। অফিসে গিয়ে অবশ্য ধরা যেতে

পারে। দুজনের অফিস ডালহৌসি পাড়ায়, একজনের ক্যামাক স্ট্রিটে।

অনুপের কপাল ভাল, তিনজনকেই পাওয়া গেল অফিসে। আর সামান্য সাধাসাধি করতেই সামনের শনিবার রাত্তিরে ওর বাড়িতে খেতে রাজি হয়ে গেল তিনজনেই। তিনজনেরই এক প্রশ্ন—হঠাৎ খাওয়াচ্ছিস কেন, কোনো সুখবর আছে নাকি ?

তিন জায়গাতেই একই উত্তর দিল অনুপ। উপলক্ষ ছাড়া কি খাওয়াদাওয়া হতে পারে না ? আসলে কতদিন একসঙ্গে আড্ডা মারা হয়নি বল্। আড্ডা তেমন জমে গেলে রাত্তিরটা না হয় থেকেই যাবি আমার ওখানে। ব্যাচেলরের বাড়ি, শোবার জায়গার অভাব নেই। তাছাড়া পরদিন তো রোববার।

তিন অফিসেই আর একটা প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল অনুপকে। সেটা হল—কী রে, এত রোগা হয়ে গেলি কী করে ?

তিন জায়গাতেই অনুপ রহস্যময় হাসি হেসে একই উত্তর দিয়েছে। তা হল ঃ কালকেও আমি বেশ মোটা ছিলাম !

রসিকতা ভেবে তিন বন্ধুই ওর কথায় খুব হেসেছে।

রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এসে মাকড়শাকে সব জানাল অনুপ। মাকড়শা সব শুনে ভারিক্কি চালে 'আচ্ছা' বলেই উধাও হয়ে গেল।

মাঝখানে একটা মোটে দিন, তারপরেই শনিবার। এই দুটো দিনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই অসম্ভব উত্তেজিত ছিল অনুপ। সেই সঙ্গে ছাড়া ছিল কল্পনার লাগাম, যা নয় তাই ভেবেছে।

শনিবার সন্ধেয় এক-এক করে তিন বন্ধুই হাজির হল ওর বাড়িতে। কলেজ-আমলের প্রাণের বন্ধু, এক জায়গায় এলে আড্ডা জ্বলে ওঠে দপ্ করে। এ-ক্ষেত্রেও তাই হল। পুরনো দিনের অসংখ্য মজার ঘটনা বর্ণগন্ধসমেত উঠে আসছিল চোখের সামনে ! কিন্তু তিন বন্ধুর মতো আড্ডায় ষোলো আনা মন দিতে পারছিল না অনুপ। ভয়ংকর এক উত্তেজনা মাঝেমধ্যেই ওকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

রাত্তির নটা বাজতে না বাজতেই খেতে বসার জন্যে তাড়া লাগাল অনুপ। বন্ধুরা এত তাড়াতাড়ি খেতে বসতে চাইছিল না, কিন্তু অনুপ জোর করল। গরম-গরম খাবারের স্বাদই আলাদা, তাছাড়া খেতে খেতে এবং খাবার পরেও তো আড্ডা চলবে অনেকক্ষণ।

নামকরা কেটারারের রাঁধুনি বাড়িতে এসে বিস্তর সুস্বাদু খাবারদাবার বানিয়েছে। টেবিলে খাবার সাজানো হল। ঝকঝকে পোর্সিলিনের পাত্রে রাখা খাবারগুলো দেখে অতিথিদের খিদে বেড়ে গেল একলাফে। খাবার থেকে ফিনফিনে ধোঁয়া উঠছিল, সেই ধোঁয়ায় সুগন্ধ।

খেতে খেতে আর সব ছেড়ে খাওয়ার গল্পই চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

অতিথিরা বেশ ভোজনরসিক, তার ওপর ক্রমাগত আর একটু খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি। তার ফল যা হবার তাই হল। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে তিনজনেই সামান্য আগেপিছে বলল—ওহ্ যা খাওয়ালি না, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে যে!

অনুপের সারা শরীরে উত্তেজনা, কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল—চল একটু গড়িয়ে নিবি। ঘুম পেলে ঘুমোস, কাল সকালে না হয় একেবারে চা-টা খেয়ে বাড়ি যাবি।

তিন বন্ধু জোড়া-খাটে সামান্য কাত হয়ে শুয়ে গল্প জুড়ল আবার। কিন্তু গল্প সামান্য কিছু দূর গড়াবার পরেই চোখ বুজে এল তিনজনের। ঘুম আসবে নাই বা কেন, একে ওই খাওয়া, তার ওপর খাবারে মেশানো ছিল ঘুমের ওষুধ। একটু পরে তিনজনেরই নাক ডাকতে শুরু করে দিল।

আলমারির পাশেই ছিল মাকড়শা। অতিথিদের নাক ডাকার শব্দে বেরিয়ে এল চটপট। তারপর অনুপের চোখের সামনে মোটাসোটা বন্ধুদের চর্বি থেকে খুব সূক্ষ্ম সোনালি সুতো বার করে রকমারি ডিজাইনের কাপড় বুনে ফেলল। অলৌকিক এই দৃশ্য দেখে অনুপের গা কেঁপে উঠছিল বারবার।

তিন বন্ধু জোড়া-খাটে শুয়েছিল কোনোরকমে, কিন্তু রোগা হতে হতে এত রোগা হয়ে গেল যে, এক খাটেই ধরে গেল ওদের তিনজনকে। ভোর-বেলায় ঘুম ভাঙল ওদের। অনুপকে আর কিছু বলতে হল না, ওরা নিজেদের চেহারা দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে মাকড়শার সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে বসে পড়ল অনুপ। মাকড়শা বলল, 'এবার তোমাকে কিন্তু খাটতে হবে।'

অনুপ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ছিল। একনিশ্বাসে বলল, 'খাটতে আমি মোটেই ভয় পাই না। বলুন কী করতে হবে?'

'কাগজকলম নিয়ে এসো, কিছু চিঠি ড্রাফ্‌ট করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে অর্ডার ধরার জন্যে কাপড়ের নমুনাসমেত চিঠি পাঠাও।'

গড়গড় করে ডিকটেশন দিচ্ছিল মাকড়শা, আর ফরফর করে লিখে নিচ্ছিল অনুপ। কী চমৎকার চিঠির ভাষা। চিঠিগুলো টাইপ করিয়ে কাপড়ের নমুনাসমেত পাঠিয়ে দেওয়া হল কয়েকটি দেশে।

দিন-সাতেকের মধ্যে উত্তর এল আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট জার্মানি, ইটালি আর জাপান থেকে। কাপড়ের নমুনা দেখে সব দেশই মুগ্ধ। উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করেছে অতি সূক্ষ্ম এই কাপড়ের। কেউ লিখেছে, 'উয়েভিং টেকনোলজিতে আপনারা পৃথিবীর আর সব দেশকে ছাপিয়ে গেছেন। কেউ লিখেছে, 'আপনাদের কাপড়ের ডিজাইন আর আর্ট-ফর্ম অতুলনীয়। কেউ

লিখেছে, 'ইসলামিক ল্যান্ডের সেই মসলিনও আপনাদের কাপড়ের কাছে কিছুই নয়।'

প্রশংসার শেষে সবাই লিখেছে : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই, টার্মস জানান। আমেরিকা বিরাট টাকার অর্ডার দিয়ে পার্টনারশিপে ব্যবসা করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ওয়েস্ট জার্মানির চিঠিতে একটি আবেদন : নো-হাউ শেখার জন্যে কয়েকজন অ্যাপ্রেন্টিস পাঠাতে চাই।

আবার ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কাগজ-কলম হাতে নিয়ে বসল অনুপ। মাকড়শা গম্ভীরভাবে চিঠির উত্তরগুলো মুখে মুখে বলে গেল। বলল, আমেরিকাকে লিখে দাও আমরা পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে রাজি নই। ওয়েস্ট জার্মানিকে লেখো, নো-হাউ আমরা শেখাব না। তবে সব দেশের সঙ্গেই ব্যবসা করতে চাই, ব্যবসার টার্মস হল··· ।

প্রায় রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠল ব্যবসা। হেড-অফিস আর ফ্যাক্টরি বসল কলকাতার বিশাল এলাকা জুড়ে। দেশের এবং বিদেশের সব রাজধানীতে একাধিক ব্রাঞ্চ-অফিস খোলা হল। ভাল মাকড়শা-প্রজনন কেন্দ্র খোলা হল অনেকগুলো। কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্যে চাকরি দেওয়া হল বহু লোককে। ব্যবসার এবং দেশের উন্নতি হতে লাগল অসম্ভব দ্রুতগতিতে। অনুপ সেই যে ডুব মেরেছিল অফিস থেকে, তারপর আর যায়নি, একদিন একটু সময় বার করে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিল।

কাজ, কাজ আর কাজ। খাওয়া-দাওয়ার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিল না অনুপ। মাকড়শা একদিন ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'এভাবে চললে বেশিদিন ব্যবসা করতে পারবে না। কিছু নিয়ম মানতেই হবে। রাত্তির আটটার পরে কোনো কাজ নয়, আর ছুটির দিনে ছুটিই নেবে, পুরোপুরি বিশ্রাম।'

মাকড়শার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে অনুপ, কিন্তু সেদিন রাত্তির আটটার পরে নাছোড়বান্দা এক অতিথিকে কিছুতেই তাড়াতে পারল না ও।

এদিকে রাত বেড়ে যেতে লাগল একটু-একটু করে। শেষে নিরুপায় হয়ে বসার ঘরে আসতে হল অনুপকে। ভদ্রমহিলার বয়েস বেশি নয়, কিন্তু অসম্ভব মোটা। বোধ হয় খুব উত্তেজনায় ভুগছেন, মাথায় টপ্ স্পীডে পাখা ঘুরছে, অথচ চোখে-মুখে-গলায় বিনবিনে ঘাম। ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, 'অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু সত্যি আমার কোনো উপায় ছিল না।' ভদ্রমহিলার কথার শেষের দিকটা হঠাৎ কান্না-কান্না হয়ে গেল।

বিব্রত হয়ে অনুপ বলল, 'আপনি বসুন। আমার কাছে কী জন্যে··· ।'

ভদ্রমহিলা নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি আপনার বন্ধু পরিমল হালদারের পিসতুতো বোন। আমার নাম শ্রাবন্তী।'

'পরিমল মানে শিবপুরের··· ।'

'হ্যাঁ, আপনাদের কলেজের বন্ধু। এই তো মাসতিনেক আগে একদিন আপনাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন··· ।'

'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ।' সব মনে পড়ে গেল অনুপের, সেই মোটা তিন বন্ধুর এক বন্ধু পরিমল। তারপরেই ওর আশঙ্কা হল, চর্বি থেকে ওভাবে কাপড় বোনার জন্যে ওর কোনো বিপদ-টিপদ হয় নি তো! একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে পরিমল?'

শ্রাবন্তী হেসে বলল, 'খুউব ভাল।' তারপরেই ওর মুখ কালো হয়ে গেল আবার।

অনুপ ঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন বললেন না তো?'

বলতেই শ্রাবন্তীর চোখ ফেটে জল পড়ল দু-ফোঁটা। তারপর মুখ নিচু করে কান্নাজড়ানো গলায় বলল, 'আমি আত্মহত্যা করব।'

আঁতকে উঠে অনুপ আর একটু হলেই বলে ফেলছিল, ভাল কথা, তবে এখানে কেন? কিন্তু মুখের কথাটা কোনো রকমে গিলে ফেলে বলল 'মানে!'

শ্রাবন্তী কেঁদে, ঠোঁট ফুলিয়ে, কেঁপে, টুকরো-টুকরো কথায় অনেকক্ষণ ধরে যে কথাটা বলল, তার মানে হল: শ্রাবন্তীর প্রেমিক শ্রাবন্তীকে ছেড়ে অন্য একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। তার একমাত্র কারণ, শ্রাবন্তী গত কয়েক মাসের মধ্যে অস্বাভাবিক মোটা হয়ে গেছে। কিন্তু মোটা হয়ে যাওয়াটা কি অপরাধ? মনের দুঃখে ও আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করেছে। করেও ফেলত এর মধ্যে যদি না দাদার কাছে ও অনুপের কথা শুনত। দাদা যাচ্ছেতাই মোটা ছিল, কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে একটা রাত্তির কাটিয়ে একেবারে ছিপছিপে হয়ে গেছে, তাই··· ।

শ্রাবন্তী রাগ, দুঃখ, অভিমান আর জেদ একসঙ্গে মিশিয়ে বলল, 'আমি আপনার এখানে আজকের রাতটা কাটাব।'

আর একবার আঁতকে উঠল অনুপ। 'সে কী কথা! আপনি ভদ্র ঘরের ···, তাছাড়া আমার ওসব দোষ টোষ··· ।'

শ্রাবন্তী এবার ফিক করে হেসে বলল, 'যাহ্ অসভ্য! আমি কি তাই বলেছি? আমি আমার দাদার মতো রোগা হবার জন্যে আপনার বাড়িতে আজকের রাত্তিরটা থাকব।'

অনুপ ওকে নিরস্ত করার জন্যে হাজারকয়েক কথা বলল, কিন্তু কোনো কাজ হল না। শেষে রাত দশটার সময় শুকনো মুখে বলল, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি কোনো উপায় বার করতে পারি কি না, যদি না পারি আপনাকে কিন্তু এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

মাকড়শা ছাতের ঘরের দেয়ালে আছে, অনুপ ছুটল সেই ঘরে। সব শুনে

মাকড়শা একটু চটে গিয়ে বলল, 'খুব অন্যায় করেছ, অনেক আগেই মেয়েটাকে বিদেয় করা উচিত ছিল তোমার। তুমি তো জানো আমাদের ব্যবসার সিক্রেট জানার জন্যে বিদেশী এজেন্ট আমাদের পিছু নিয়েছে।'

মাকড়শার কথার মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই, ওদের ব্যবসার গোপন কথা জানার জন্যে সত্যিই কিছুদিন হল বিদেশী গুপ্তচর খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। অনুপ এমনিতে বেশ রাশভারী, জবরদস্ত, কিন্তু মেয়েদের কান্নার সামনে চট করে বিহ্বল হয়ে পড়ে। এখন গিয়ে শ্রাবন্তীকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করা অসম্ভব। মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকল অনুপ। ওর অবস্থাটা আন্দাজ করে মাকড়শা বলল, 'ঠিক আছে চলো, তবে এবারই শেষবার, এরকম অনুরোধ আর কখনো আমাকে করবে না। সরবতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেল আগে।'

অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতির হাত থেকে বেঁচে গিয়ে হাঁপ ছাড়ল অনুপ। তারপর বেয়ারাকে সরবত বানানোর নির্দেশ দিয়ে শ্রাবন্তীর কাছে গিয়ে বলল, 'আসুন, এ-ঘরে আসুন।'

ঝলমলে মুখে শ্রাবন্তী উঠে এল। কিন্তু অনুপের শোবার ঘরে পা দেবার পরেই ওর চোখে কেমন যেন সন্দেহর ছাপ ধরল। থমথমে গলায় বলল, 'এখানে, এখানে কেন?'

ঘুমের ওষুধমেশানো সরবত নিয়ে এসেছে বেয়ারা। অনুপ আদেশের গলায় বলল, 'এটা খেয়ে নিন।'

শ্রাবন্তীর চোখে সন্দেহর ছাপটা এখন আরো গাঢ় হয়ে গেছে। ও খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

অনুপ গলার স্বর ভারী করে বলল, 'সরবত, খেয়ে নিন চটপট।'

দোনামনা করে সরবতটা খেয়ে নিল শ্রাবন্তী। অনুপ বিছানার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওখানে বসুন।'

এবার শ্রাবন্তী রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

ওকে ভয় পেতে দেখে হাসি পেল অনুপের। বলল, 'ভয়ের কোন কারণ নেই, রোগা হওয়ার ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি আপনাকে। যদি শরীর খারাপ লাগে শুয়ে পড়বেন বিছানায়।'

রক্ত সরে গিয়ে মুখটা অস্বাভাবিক রকমের ফ্যাকাশে হয়ে গেছে শ্রাবন্তীর। ও কেমন যেন অন্যের পায়ে হেঁটে গিয়ে বিছানায় বসল। একটু পরে আস্তে আস্তে কাত হল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল অকাতরে।

ঘুমোতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মাকড়শা। তারপর মেয়েটির চর্বির থাক থেকে নানা ডিজাইনের কাপড় বুনতে শুরু করে দিল। এই ক'মাসে এসব অনেক দেখেছে অনুপ, কিন্তু ওর বিস্ময় এখনো গেল না। চোখের

সামনে চর্বির পাহাড় ছোট হতে শুরু করে দিয়েছে। আটটা পায়ে মাকড়শা দ্রুতগতিতে ছুটছে মেয়েটির সারা গায়ে, তারপর শূন্যে লাফিয়ে উঠে চর্বি থেকে সুতো কেটে নকশাদার কাপড় বুনে চলেছে একটার পর একটা। উজ্জ্বল আলোয় কাপড়গুলোর চেকনাই ফেটে পড়ছিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মেয়েটির শরীরের সমস্ত বাড়তি চর্বি উধাও হয়ে গেল। মাকড়শার কর্মক্ষমতা অসীম, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্যে ওর গায়ে ঘাম জমে গিয়েছিল বিন্দু-বিন্দু। অনুপ মাকড়শাকে কী যেন বলতে গিয়ে ভুলে গেল বেমালুম।

শ্রাবন্তীর শরীরে ওর চোখ আটকে গিয়েছিল। চর্বির পাহাড় এই মেয়েটির মধ্যে এত রূপ লুকিয়ে ছিল কী ভাবে! এখন যেন অঙ্কের মাপে বানানো ওর শরীর। শরীরের প্রতিটি উঁচু-নিচু রেখা আর ভাঁজগুলো নিখুঁত ও লাবণ্যময়। কাটা-কাটা চোখমুখের রূপসী শ্রাবন্তীকে দেখে অনুপের কেমন যেন এক ঘোর তৈরি হল। প্রায় মাঝরাত এখন, জামগাছের পাতার খসখস শব্দ স্নিগ্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছিল ঘরের মধ্যে। ওই শব্দ, হাওয়া আর শ্রাবন্তীর অসামান্য রূপ একসঙ্গে মিশে গিয়ে বিচিত্র এক শিরশিরানি সৃষ্টি করেছিল অনুপের সর্বাঙ্গে।

এমন সময় ঘুম্-ঘুম্ শব্দ। চমকে গিয়ে অনুপ তাকাল মাকড়শার দিকে। মাকড়শার কাশির আওয়াজটা অদ্ভুত, একই ভঙ্গিতে আর একবার কেশে মাকড়শা গম্ভীর গলায় অনুপকে বলল, 'তুমি আজ ও ঘরে শোবে। অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। যাও।'

অনুপের এই প্রথম মনে হল, মাকড়শা বড্ড বেশি অভিভাবকগিরি ফলায়! কিন্তু ওই আদেশ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই ওর। অনুপ ঘরের আলো নিবিয়ে, দরজা বন্ধ করে পাশের ঘরে চলে গেল।

। চার ॥

অনুপ যত রাত্তিরেই ঘুমোক না কেন সকালে একটা নির্দিষ্ট সময় ওর ঘুম ভেঙে যাবেই। সময়টা জানা আছে বেয়ারাদের, ঠিক তখনই বেড-সাইড টেবিলে চা চলে আসে। কেতাদুরস্ত বেয়ারা প্রথমেই মৃদু গলায় একটা 'গুড মর্নিং' জানায়, তারপর একটুও শব্দ না করে টেবিলের ওপর চায়ের ট্রে নামিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আজ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম হল। চায়ের ট্রে নামাবার পরে বেয়ারা বলল, 'সাব্, মেমসাব্ আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে বসে আছেন।'

'মেমসাব্ ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্তিরের সব কথা মনে পড়ে গেল অনুপের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, একটু বসতে বলো, আমি আসছি।'

মিনিট-পাঁচেক পরে শোবার ঘরে ঢুকতেই আর একবার ভীষণভাবে চমকে উঠল অনুপ। বিছানার এক প্রান্তে লাজুক হয়ে বসে আছে অসামান্য রূপসী শ্রাবন্তী। শ্রাবন্তী ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে গিয়েও পারল না। তারপর লঘু পায়ে প্রায় ছুটে এসে অনুপের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি···আপনি···আপনি।' তিনটে তিন ধরনের 'আপনি' বলার পরে টসটস করে জল পড়তে লাগল ওর চোখ থেকে।

অনুপ এতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল যে, কয়েক মুহূর্ত ওর মুখ থেকে কোনো কথাই বার হল না। তারপর কোনোমতে বলল, 'আরে কী হল! আপনি বসুন।'

শ্রাবন্তী ওর হাত ছেড়ে দিয়ে চোখের জল মুছল। ওর চোখে এখন আর জল নেই, কিন্তু সেই টলটলে ভাবটা আছে, দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, নাকি সেই সঙ্গে আরো কিছু!

শ্রাবন্তী এবার কিছুটা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'না আর বসব না। বাড়িতে, বাড়িতে কী হচ্ছে জানি না, কাল সন্ধেয় কাউকে কিছু না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ, সেই জন্যেই·· আমি এখন যাই।' কথাটা বলার পরে গভীর চোখ তুলে শ্রাবন্তী অনুপের দিকে তাকাল, তারপরে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শ্রাবন্তী চলে যাবার পরে অনুপ ঠিক একই ভঙ্গিতে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে ফিরে এল আবার। সবকিছু এখন আগের মতো ঠিকঠাক, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, কোথায় যেন একটা বড় রকমের গোলমাল হয়ে গেছে। সকালের চমৎকার রোদ জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। হাওয়ায় সকালের রোদ্দুরের মনোরম তাপ। এই সকালগুলো অনুপের খুব ভাল লাগে, আজকেও ভাল লাগছিল, কিন্তু কোত্থেকে অদ্ভুত এক শূন্যতা এসে ওকে বিষণ্ণ করে তুলছিল মাঝেমধ্যে। এরকম তো হয় না, হওয়ার তেমন কোনো কারণও নেই।

জোর করে যুক্তি-বুদ্ধির সামনে নিজেকে দাঁড় করাল অনুপ। বিশাল এক আন্তর্জাতিক ব্যবসার মালিক হওয়ার পর থেকে অনুপের প্রায় প্রতিটি মিনিট নানা কাজের জন্য ভাগ করা থাকে। গাদা-গাদা সময় হাতে নিয়ে আলসেমি করার দিনগুলো যেন গত জন্মের। মাঝেমাঝে কাজের চাপ থেকে একটা ক্লান্তি

তৈরি হয়, জরুরি কোনো কাজ পণ্ড করার ইচ্ছে তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু ওই পর্যন্তই! ব্যবসার অকল্পনীয় সমৃদ্ধি দেখে ও আবার কাজের নেশায় মেতে ওঠে। সারা পৃথিবীর ওপর ছড়ি ঘোরাবার খেয়াল কখনো-কখনো ওকে ভয়ংকর উত্তেজিত করে তোলে। দুনিয়াটা টাকার বশ—কথাটা যে কত সত্যি, এ-পৃথিবীতে অনুপের মতো আর কেউ বোধহয় বোঝে না।

সারা পৃথিবীতে অলৌকিক ওই কাপড়ের ব্যবসা দাপটের সঙ্গে চলছে। গোটা পৃথিবী এখন জানে প্রতিটি বৈদেশিক মুদ্রা এখন যে দেশে গিয়ে পাহাড় তৈরি করছে, তার নাম ভারতবর্ষ। পৃথিবীর বিজনেস-ম্যাগনেট্‌রা যে শিল্পপতিটিকে ঈর্ষা করে তার নাম অনুপ রে। পৃথিবীর ধনী দেশের ছোট্ট তালিকায় ভারতবর্ষের নাম জ্বলজ্বল করছে এখন। কিন্তু যার জন্যে করছে সেই মানুষটির মন আজ অজ্ঞাত এক কারণে উদাস হয়ে উঠেছে।

তবে আজকের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট চার্টের দিকে তাকাতেই উদাস হওয়া ভাবটা উধাও হয়ে গেল অনুপের। ইশ্‌! এর মধ্যেই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক সাড়ে-আটটার সময় হোটেলে বেলজিয়ান এক সাহেবের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার নেমন্তন্ন। আধুনিক ব্যবসার রীতিটা অদ্ভুত, খাবার টেবিলে বিজনেস ডীল হয়। তার আগে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাকড়শার কাছে মাকড়শার ভাষা শেখার ক্লাস। মাকড়শার ভাষা শেখার ইচ্ছে অনুপের বরাবরই ছিল, কিন্তু সেটা আগে ছিল নেহাতই শখ, এখন শিখছে প্রয়োজনে।

ওদের ব্যবসার গোপন রহস্য জানার জন্যে বিদেশী এজেণ্টরা পিছু নিয়েছে। গুপ্তচররা তৎপর, অনুপকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। তাই মাকড়শার পরামর্শে মাকড়শার ভাষা শিখছে ও। ব্যবসার গোপন কথাগুলো এখন মাকড়শার ভাষাতেই হয়। সে-সব কথা কেউ শুনে ফেললেও ভয়ের কোনো কারণ নেই। ওই ভাষার একটা বর্ণও উদ্ধার করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

মাকড়শার ভাষাটা অদ্ভুত। বর্ণমালার চেহারা অন্যরকম, আর ব্যাকরণের কোনো মা-বাপ নেই, উচ্চারণ খটমটে। প্রথমদিকে কান্না পেয়ে যেত অনুপের, মনে হত এর চাইতে পৃথিবীর দশটা অজানা ভাষা একসঙ্গে শেখাও বোধহয় অনেক সহজ। কিন্তু মাকড়শা অসম্ভব ভাল মাস্টারমশাই, আর তার ধৈর্যও তুলনাহীন। মাকড়শার চেষ্টাতেই অনুপ এখন ওই ভাষায় ভাঙা-ভাঙা কথা বলতে পারে। ভাষা শিখতে পেরে অনুপের এখন খুব আনন্দ। ব্যবসার গোপন কথাবার্তা বলার সময় ছাড়াও ও মাঝেমধ্যে মাকড়শার সঙ্গে মাকড়শার ভাষাতেই কথা বলে। বিদেশী ভাষা যত বেশি চর্চা করা যায় ততই রপ্ত হয়। সেদিন ও ছাতের রেলিংয়ে ঝুঁকে জামগাছের পাতার ওপর বসে-থাকা মাকড়শার বান্ধবীর সঙ্গেও ওই ভাষায় কথা বলেছিল। অনুপের মুখে নিজেদের ভাষা শুনে মাকড়শার বান্ধবী তো অবাক, তারপর লজ্জায় পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

ওর লজ্জা পাওয়ার কারণটা ধরতে পেরেছিল অনুপ। মাকড়শা ওর বান্ধবীকে অনুপের সেই উদ্ভট আশঙ্কার কথাটা বলেছিল। শুনে ওর বান্ধবীর সে কি হাসি! এ সব কথা মাকড়শাই অনুপকে বলেছে। তারপর এ-কথাও বলেছে: কই বহুদিন তো বান্ধবীর সঙ্গে কাটালাম, কিন্তু এখনো তো মরিনি! তোমাদের ভাষায় যাকে মিলন-টিলন বলে, সে-সব তো বান্ধবীর সঙ্গে বহুবার আমার হয়েছে, কিন্তু সে তো আমাকে মেরে ফেলেনি এখনো। আসলে তোমরা, মানে মানুষরা—কুসংস্কারের ডিপো। তোমরা কুসংস্কার যেমন মানো তেমনি ছড়াও। সত্যিকারের সভ্য হওয়ার জন্যে তোমাদের এখনো হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের সমাজে সঙ্গী বা সঙ্গিনী পালটানো দোষের বা বাহাদুরির ব্যাপার নয়। অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং নারী-পুরুষঘটিত কোনো রকমের কেলেঙ্কারি আমাদের সমাজে নেই।

মাকড়শার ভাষা শেখার ক্লাসে যাবার আগে তৈরি হতে হতে এইসব নানান কথা অনুপের মনে পড়ছিল। আর সেইসঙ্গে মাঝেমধ্যে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল রূপসী শ্রাবন্তীর মুখ। চলে যাবার আগে কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে শ্রাবন্তী ওর হাত জড়িয়ে ধরেছিল, সেই স্পর্শসুখটাও কী এক অলৌকিক উপায়ে বারবার ফিরে আসছিল ওর শরীরে।

ঠাসা সূচি ধরে অনুপের কাজ চলল সারাদিন। রাত্তির আটটায় একটা হট-বাথ নেবার পরে ও প্রথম বিশ্রামের নিশ্বাস ফেলল। এই সময় মাকড়শার সঙ্গে ওর একটু গল্পগুজব হয়।

মাকড়শা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'আজকের বি বি সি নিউজটা শুনেছ?'

'না তো।'

মাকড়শার হাসিটা ছড়িয়ে গেল অনেকখানি। 'দারুণ খবর।'

'কী রকম?'

'আমাদের কাপড়ের নকল বেরিয়ে গেছে বিদেশের বাজারে।'

'তাই নাকি?' এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করল অনুপ।

এবার মাকড়শা একটু গম্ভীর হল। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কনজারভেটিভরা আমাদের কাপড় নিয়ে খুব চেঁচামেচি করে বলেছে, ওদের বাজারে আমাদের কাপড় নিষিদ্ধ করে দিতে হবে! এই কাপড়ের ক্রেজ ব্রিটিশারদের মধ্যে এত বেড়ে গেছে যে, দেশটা ডুবতে বসেছে প্রায়। ওদের কাপড়ের কলগুলো অকেজো হয়ে এসেছে। তার ফলে লক-আউট, লে-অফ। ওদের দেশে বেকারি আর দারিদ্র্য যে হারে বাড়ছে ঠিক সেই হারে কমছে নৈতিক মান।'

'নৈতিক মান?'

মাকড়শা এবার ঠাট্টার গলায় বলল, 'নীতির দিক থেকে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের শুধু ডিগ্রির তফাত। আসলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই তো নীতিবাগীশ।

অনুপ মাকড়শার কথার ভেতরের অর্থটা ধরতে পারল না। একটু হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমাদের কাপড়ের সঙ্গে নৈতিক মান বাড়া-কমার কী সম্পর্ক ?'

মাকড়শা এবার ছোট্ট একটা ধমক লাগিয়ে বলল, 'বড়লোক হবার পর থেকে দেখছি তোমার বুদ্ধিটা একটু খাটো হয়ে গেছে।'

এ কথার কোনো জবাব হয় না, অনুপের মুখটা একটু করুণ হয়ে উঠল।

ভাষা শেখানোর ক্লাসে মাকড়শা যেমন মাস্টারমশাইয়ের ঢঙে কথা বলে, ঠিক সেই ভঙ্গিতে বলল, 'আমাদের কাপড় গল্পের সেই মসলিনের চাইতেই স্বচ্ছ, জানো তো ?'

'হ্যাঁ।' বিনীত ছাত্রের মতো উত্তর দিল অনুপ।

'এত স্বচ্ছ যে, ওই কাপড় কেউ পরলে তার শরীরের সব অংশ বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাই না ?'

'হ্যাঁ।' অনুপ এবারও ঠিক আগের ভঙ্গিতে উত্তর দিল।

মাকড়শা হেসে বলল, 'তাই যদি হয়, ওই কাপড়-পরা ছেলেমেয়েদের দেখে নীতিবাগীশরা বলবে না, এদের নৈতিক মান একেবারে রসাতলে গেছে।'

কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র হতে অনুপের আর ভাল লাগছিল না। গলায় মৃদু অভিমান আর অসন্তোষ এনে বলল, 'কিন্তু এইসব অভিযোগ আমাদের কাপড় বাজারে ছাড়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছে, এর মধ্যে নতুন কী আছে ?'

মাকড়শা একটু শব্দ করে হেসে বলল, 'আছে। আছে বলেই তো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নতুন করে ঝড় উঠেছে। বলছিলাম না, আমাদের কাপড়ের নকল বেরিয়ে গেছে। বি বি সি নিউজে শুনলাম আজ লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে এক ডজন যুবক-যুবতীকে ধরা হয়েছে আমাদের কাপড় পরার অভিযোগে।'

'আমাদের কাপড় পরার অভিযোগে ?

'আমাদের কাপড় নয়, আমাদের মতো কাপড় পরার অভিযোগে।'

'কাপড়ের মতো ?' মাকড়শার হেঁয়ালির মানে বার করতে পারল না অনুপ।

রহস্যের ছাপটা সারা মুখে ছড়িয়ে রেখে মাকড়শা বলল, 'হ্যাঁ কাপড়ের মতো। সবাই প্রথমে ভেবেছিল ওরা আমাদের কাপড় পরেছে। পরে দেখা গেল, ওরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে।'

অনুপ এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ওর চোখে জল এসে গেল প্রায়। একফাঁকে কোনো মতে বলল, 'দারুণ নকল কাপড় তো !'

এইসব নিয়ে কথাবার্তা আরো কিছুক্ষণ গড়াবার পরে অনুপ বলল,

'বিদেশের বাজারে আমাদের ব্যবসা তো একচেটিয়া, কিন্তু দেশের কাপড়কলের মালিকরা আড়ালে আমাদের নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাশা করে।'

'কীরকম ?'

'ঈর্ষা থেকে বলে. আমাদের ব্যবসাটা নাকি ধোঁকাবাজির ব্যবসা। তার কারণ আমরা দেশের বাজারে ঢুকতে পারছি না। দেশের লোক আমাদের কাপড় পরে না।'

মাকড়শা হেসে বলল, 'দেশের বাজারে ঢুকতে পারছি না—কথাটা ভুল, আমরা তো ঢোকার চেষ্টাই করিনি। এত স্বচ্ছ কাপড় এদেশের মানুষ পরতে লজ্জা পায়। আমরা যদি একটু মোটা কাপড় তৈরি করি এখানকার কাপড়-কল মালিকদের ব্যবসা লাটে উঠে যাবে।'

অনুপ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু মোটা কাপড় কি আপনি তৈরি করতে পারবেন ?'

মাকড়শার মুখে রহস্যময় হাসিটা ফুটল। 'কী মনে হয় ?'

আমতা-আমতা করে অনুপ বলল, 'না, মানে, মাকড়শারা তো শুধুই পাতলা ফিনফিনে জাল বুনতে পারে।' ওর অজ্ঞতায় করুণার হাসি হাসল মাকড়শা, তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রাণী-জগৎ সম্পর্কে তোমরা যা জানো সেটা না জানার সামিল। মাঝেমধ্যে একটু জানার চেষ্টা করলে তো কোনো দোষ হয় না।'

মৃদু ভর্ৎসনায় বিব্রত হল অনুপ। মাকড়শা বলল, 'আমাদের মধ্যে নানা জাত আছে। এক-এক জাতের এক-এক রকম চেহারা, এক-এক রকম স্বভাব। থাকার জায়গাও আলাদা-আলাদা। কেউ গাছে থাকে, কেউ পাথরের ফাঁকে, কেউ বা জলে।'

তথ্যগুলো জেনে পুলকিত হবার কিছু নেই, কিন্তু নিজের অজ্ঞতা দূর করার জন্যে অনুপ অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠল।

মাকড়শা ওর দিকে তাকিয়ে আগের কথার জের টানল। 'আমাদের কিছু আত্মীয়-স্বজন সাউথ-ইস্ট এশিয়ার জঙ্গলে থাকে। তাদের চেহারা আমার চেয়েও বড়। তাদের বোনা জালগুলোও বড়-বড়। এক-একটার মাপ প্রায় আট ফুট। সোনালী সুতোগুলো বেশ মোটা। আর এত শক্ত যে, ওখান-কার জেলেরা ওই সুতো দিয়ে মাছ ধরার জাল বানায়। আমাদের দেশের লোকদের কাপড় তৈরি করার ব্যাপারে আমি ওদের সাহায্য নেব।'

শুনে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল অনুপ!

মাকড়শার কথা আর কাজের মধ্যে এক চুলও তফাত নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পনা রূপায়ণের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল অসম্ভব দ্রুত গতিতে।

॥ পাঁচ ॥

সাউথ-ইস্ট এশিয়ার জঙ্গল থেকে মাকড়শার কয়েকজন আত্মীয়কে আনা হয়েছে। তাদের চেহারা ভয়ংকর, আটটা রোমশ পা নাড়িয়ে যখন তীব্র চোখে তাকায় তখন অনুপের বুক কেঁপে ওঠে। প্রথমদিকে তারা কিছুতেই নিজেদের শরীরের লালা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে জাল বুনতে চাইছিল না। তাদের নাকি ধর্মীয় বাধা আছে। এই সংস্কার কাটিয়ে বশে আনতে সময় লাগল। তারপর তারা মানুষের শরীরের চর্বি থেকে কাপড় বুনতে শুরু করল।

প্রথম দিকে সেই কাপড় মাকড়শার 'স্পেসিফিকেশন' অনুযায়ী হচ্ছিল না। একটু বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এই ত্রুটি সংশোধন করতে বেশি দেরি হল না। অসামান্য সব কাপড় বেরিয়ে আসতে লাগল পরের পর। সাউথ-ইস্ট এশিয়ার মাকড়শাদের নিজস্ব ঘরানার ছাপ সেই সব কাপড়ে। কী চমৎকার কাপড়, একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না।

টেক্সটাইল ইনডাসট্রির ভাষায় ওই সব কাপড়ের ফ্লেক্সিবিলিটি, স্ট্রেংথ, থিকনেস আর ওয়েট পার ইউনিট এরিয়া তুলনাহীন।

মাকড়শা বেশ খুঁতখুঁতে স্বভাবের। কথায় কথায় বলে, পারফেকশনিস্ট হওয়ার বিপদ অনেক, কাজ মনোমত না হলে কাজে মন বসে না। এই কাপড় দেখে মাকড়শাও সন্তুষ্ট হল। তারপর অনুপকে বলল, 'এবার আমরা আমাদের দেশের বাজার ধরব, তবে অর্থনীতির নিয়ম মেনে চলতে হবে। প্রথমেই লাভ করতে চাইবে না। বাজার ধরতে হবে নো লস, নো প্রফিট বেসিসে। দরকার হলে আমরা লোকসান খেয়ে কমপিটিটরদের হটাব।'

দেশের বাজারে এই কোম্পানির নাম হল 'পমা'। নামটি অনুপের দেওয়া। অনুপের প আর মাকড়শার মা নিয়ে 'পমা'। এই নাম দেওয়ার পেছনে অনুপের যুক্তি হল, নামটা বেশ বিদেশী-বিদেশী। অল্প একটু চন্দ্রবিন্দু মিশিয়ে উচ্চারণ করলে ফরাসী-ফরাসী শোনাবে। ওদিকে আবার নামের শেষে মা থাকার ফলে ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ভারতীয়রা খুশি হবে।

'পমা'র কাপড় দেশের বাজারে বেরুতেই হৈ-চৈ পড়ে গেল রীতিমত। লাইন লাগিয়ে সবাই কিনতে লাগল এই কাপড়। দেশের বাকি সব কাপড়-মালিকরা গালে হাত দিয়ে বসল। তাদের ব্যবসা ডুবতে বসেছে প্রায়। পমার কাপড় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কেউ আর অন্য কাপড়ের দিকে ফিরেও তাকায় না। নিরুপায় হয়ে বিরাট লোকসান মেনে নিয়ে অন্য কাপড়কলের মালিকরা ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্টে কাপড় ছাড়ল বাজারে, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হল না।

ভারতবর্ষে এখন আর আগের সেই 'সেল'-এর চাহিদা নেই, কারণ অনুপদের কাপড়ের দৌলতে দেশের মানুষের পকেটে এখন অঢেল পয়সা। শস্তায় কিছু

কেনার ঝোঁক এখন আর আগের মতো নেই।

আগে ছিল শুধুই বিদেশের বাজার, এখন দেশের বাজারেও বিরাট ব্যবসা। আন্তর্জাতিক এই কোম্পানিতে অসংখ্য যোগ্য লোক কাজ করে, কিন্তু নতুন কোনো ভেনচার হাতে নিলেই অনুপের কাজ বেড়ে যায় কিছুটা, আর সেই সঙ্গে বাড়ে উত্তেজনা। অবশ্য উত্তেজনার তেমন কোনো কারণ নেই, কেননা এই ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া, সব জায়গাতেই সোনা ফলায়।

অল্প সময়ের মধ্যে দেশের কাপড়ের বাজার পুরোপুরি কব্জায় এসে গেল। মাকড়শা আর অনুপ এখন খুব খুশি। খুশি হওয়ার একটা বড় কারণ হল। দেশের কাপড়কল-মালিকদের বেশ জব্দ করা গেছে। দুদিন আগে পর্যন্ত ওই মালিকগুলো অনুপদের নামে কুৎসা গেয়ে বেড়াত। বলত, আন্তর্জাতিক বাজারে ওই মসলিনের ব্যবসা নিছক ধোঁকাবাজির ব্যবসা। হিম্মত বুঝব যদি তোমরা দেশের বাজার ধরতে পারো। এখন ঠ্যালা বোঝো!

শনিবারের দুপুরে হেডঅফিসে নিজের চেম্বারে বসে এই সব ভাবতে ভাবতে এক ধরনের তৃপ্তি পাচ্ছিল অনুপ। কিন্তু এই তৃপ্তির রেশটা কেটে যাচ্ছিল মাঝেমধ্যে, আর তখনই কেমন এক শূন্যতা চেপে ধরছিল ওকে। মনে হচ্ছিল এবার কী? এর পরে কী? অর্থ এবং সাফল্যের চূড়ায় উঠলে কি এই ধরনের অবসাদ দেখা দেয়!

দার্শনিক একটা চিন্তার মধ্যে ঢোকার মুখে পি বি এক্স থেকে জানাল, 'শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, লাইনটা দেব।'

কপালে ভাঁজ পড়ল অনুপের, কে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়?

তারপরেই এয়ারকন্ডিশন্ড চেম্বারের মধ্যে অলৌকিক উপায়ে বাইরের এক ঝলক ফুরফুরে হাওয়া উড়ে এল। এই শ্রাবন্তী কি সেই শ্রাবন্তী?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে পি বি এক্স-কে বলল, 'দিন'।

টেলিফোনে দারুণ সুরেলা গলা—'আমি মিস্টার অনুপ রে-র সঙ্গে কথা…।'

'বলুন।'

'নমস্কার। আমি শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, চিনতে পারছেন?'

সেই গলা, অনুপের বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল, কিন্তু ও যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বলল, 'একটু রেফারেন্স যদি…।'

টেলিফোনের ওদিকে কিছুক্ষণের বিরতি, তারপর সেই সুরেলা গলাটা ভেসে এল আবার। 'মানে, আমি সেই এক রাত্তির আপনার বাড়িতে…মানে রোগা হবার জন্যে…।'

ঝলমল করে অনুপ উত্তর দিল, 'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আবার কী প্রবলেম? আবার মোটা হয়েছেন নাকি?'

আহত গলায় শ্রাবন্তী বলল, 'কেন, প্রয়োজন ছাড়া কি ফোন করতে পারি

না ?'

'ন্‌না, কেন পারবেন না, অবশ্যই পারেন। তবে আপনার ওই প্রবলেমটা তো আবার দেখা দিতেও পারে, এরকম হয় তো। হয় না ?'

'কেন হবে না, তবে আমার ক্ষেত্রে উলটোটা হয়েছে।'

'কীরকম ?'

'জানেন আমি আরো রোগা হয়ে গিয়েছি।'

'সে কি ! কেন ?'

'যে জন্যে রোগা হয়।'

'কী জন্যে ?'

'মনের দুঃখে।'

অনুপ হেসে উঠে বলল, 'কিন্তু মনের দুঃখ থাকার আর কোনো কারণ তো নেই। পুরনো প্রেমিক নিশ্চয়ই আবার ফিরে এসেছে।'

শ্রাবন্তী এবার চটে গিয়ে বলল, 'ফিরে এলেই আমাকে নাচতে হবে নাকি ? আমি ওর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখব না, কখনোই না।'

'কেন ?'

'জানি না।'

দু-প্রান্তের কেউই আর কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। টেলিফোনে কথা না গড়ালে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়, সেই অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল দুজনের মধ্যেই। তারপর শ্রাবন্তী বলল, 'আজ বিকেলের দিকে খুব ব্যস্ত আছেন ?'

অনুপের বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি তোমার জন্যে সব কাজ পণ্ড করতে রাজি আছি, কিন্তু মুখে বলল, 'কেন ?'

'না, এমনি বলছি, মানে কাজ না থাকলে একটু গল্প করা যেত।'

'বেশ। কোথায় ? কখন ?'

'আপনি বলুন।'

'ন্‌-না, আপনিই বলুন।'

'পাঁচটার সময়, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে।'

'ঠিক আছে।'

'ছাড়ছি তাহলে !'

'আচ্ছা।'

অন্যান্য দিন ঝড়ের গতিতে সময় দৌড়য়, কিন্তু আজ অনুপের মনে হচ্ছিল সময় আর এগোচ্ছেই না। অনেক দরকারি কাজেও হাত দিল না, থাক পড়ে থাক। শরীর খারাপের অজুহাতে দরকারি কয়েকটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও বাতিল করে দিল। দুপুর আড়াইটে থেকে পাঁচটা বাজল প্রায় তিন যুগ বাদে।

পাঁচটার কিছু আগেই প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল অনুপ।

পাঁচটা প'াচের সময় ময়দান আর আশেপাশের রাস্তাঘাট আলো করে শ্রাবন্তী এল। সেই সেদিনের চাইতেও আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। অবাক কান্ড, এই শ্রাবন্তীকেই ঢেকে রেখেছিল বিদঘুটে এক চর্বির পাহাড়। সেই পাহাড়ের ছবিটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না অনুপ।

শ্রাবন্তী কাছে এসে লাজুক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ ?'

অনুপ বলল, 'এই তো, একটু আগে।'

রাস্তার পাশের চওড়া ফুটপাথ ধরে হ'াটতে লাগল ওরা আস্তে আস্তে। কারও মুখে কোনো কথা নেই, অথচ টেলিফোনে সেই কথা না বলে চুপ করে থাকার অস্বস্তিও নেই। অনুপ এই প্রথম অনুভব করল, কথা না বলার আনন্দও কত গভীর হতে পারে! রোদ্দুর নরম আর আবছা হয়ে এসেছিল। স্নিগ্ধ বাতাসে শ্রাবন্তীর অ'াচলের প্রান্ত মাঝেমধ্যে ছু'য়ে যাচ্ছিল অনুপকে। বাতাস সুগন্ধী করে হ'াটছিল শ্রাবন্তী।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলল শ্রাবন্তী। 'আপনি কাজের মানুষ, এভাবে ডেকে এনে কাজের ক্ষতি করলাম, না ?'

'ন-না, কী আশ্চর্য! আরে—'

বোকার মতো উত্তর দেবার জন্যে মনে মনে নিজেকে ধমকালো অনুপ। ও তো বলতে পারত, বলতে পারত—কাজের ক্ষতি করা যে কত আনন্দের, এই প্রথম জানতে পারলাম। কিন্তু অনুপ বরাবরই লক্ষ্য করেছে, ভাল-ভাল জবাবগুলো ওর বরাবরই দেরিতে মনে আসে! এত দেরিতে যে তখন বলা আর না-বলা দুই সমান।

দুপুর আড়াইটে থেকে পাঁচটা বাজতে প্রায় তিন যুগ লেগে গিয়েছিল, অথচ অনুপ এখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, একটি ঘণ্টা কেটে গেল এক নিমেষে।

ঘাসভর্তি ময়দানে ওরা পাশাপাশি বসে আছে। আকাশ থেকে ঝুরঝুর করে চমৎকার অন্ধকার নেমে এসে চারদিকটা ঢেকে দিয়েছে প্রায়।

এই এক ঘণ্টা অনর্গল কথা বলে গেছে শ্রাবন্তী, অনুপও কম বলেনি। সম্পূর্ণ অকাজের কথা বলা এবং শোনায় যে এত আনন্দ, এর আগে অনুপ আর কখনো এমন ভাবে জানতে পারেনি। ভীষণ ইচ্ছে করছিল, সারা রাতটা ঠিক এইভাবে কাটিয়ে দিতে। মনে হতেই অনুপ একটু হেসে বলল, 'একটা রাত্তির তো আমার বাড়িতে কাটিয়েছিলেন, আজকের রাতটা মাঠে কাটাবেন ?'

'আপনার বাড়িতে তো একা-একা রাত কাটিয়েছিলাম, এখানেও কি একা থাকব ?'

'একা থাকলে আমার কী লাভ ? আমিও থাকব।'

মৃদু একটা হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়ল শ্রাবন্তীর ঠোঁটে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি আছি।'

কথাটা কানে যেতেই বিচিত্র এক সুখের অনুভূতি দৌড়ে গেল অনুপের সারা শরীরে, কিন্তু একটা খোঁচা দেবার লোভ ও সামলাতে পারল না। 'আপনি আমার সঙ্গে রাত্তিরে এখানে থাকলে আপনার প্রেমিকটি কিন্তু অসম্ভব চটে যাবে।'

ওই ছেলেটির কথা অনুপ ঠাট্টা করে এর আগেও দু-চারবার তুলেছিল। শ্রাবন্তী অস্বস্তি পেয়েছিল ঠিকই, তবে হালকা কথার উত্তর দিয়েছিল হালকা ভাবেই। ও এবার বেশ রেগে গিয়ে বলল, 'ওই বাজে ছেলেটার কথা বারবার আমাকে শোনাবেন না তো, ওর সঙ্গে সত্যি বলছি আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই।'

খোঁচা দেবার স্বভাবটা অনুপকে কেমন যেন পেয়ে বসেছিল। ও বলল, 'কিন্তু ও তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। রোজ-রোজ ওকে এভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয়?'

'হয়।'

'কেন হয়?'

'সে অনেক কথা।'

'সে-সব কথা বাইরের লোককে বলা যায় না?'

'আপনি বাইরের লোক নন।' গলায় আচমকা একগাদা আবেগ ঢেলে কথাটা বলে ফেলে অন্যদিকে মুখ ফেরাল শ্রাবন্তী। শুধু এই মুহূর্তেই নয় পরেও বেশ কিছুক্ষণ বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেল না অনুপ।

অনেকক্ষণ পরে শ্রাবন্তীর হাত হাতের মধ্যে তুলে নিল ও। উষ্ণ, নরম হাত। হাতের আঙুলে, তালুতে বিদ্যুতের মৃদু প্রবাহ। ওই প্রবাহ দ্রুত সঞ্চারিত হচ্ছিল অনুপের শরীরে। মনে হচ্ছিল, পৃথিবী যদি এই মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায়, ওর বিন্দুমাত্র আফসোস হবে না।

টুকরো-টুকরো কথা, হাসি আর গল্পের ভেতর দিয়ে ঝড়ের গতিতে আরো দু-ঘণ্টা কেটে যাবার পরে শ্রাবন্তী বলল, 'বেশ রাত হয়ে গেছে, এবার উঠতে হবে যে।'

উঠি-উঠি করে আরো কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর উঠে পড়ল ওরা।

শ্রাবন্তীর বাড়ির কাছাকাছি গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবার সময় অনুপ বলল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

শ্রাবন্তী চাপা গলায় বলল, 'ফোনে জানাব।'

লেটেস্ট মডেলের বিদেশী গাড়ির অ্যাক্সিলারেটরে সামান্য চাপ দিলেই গাড়ি প্রায় উড়ে যায়, কিন্তু এই গাড়ি নিয়ে সত্যি-সত্যিই উড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল অনুপের। চোখের সামনে যা পড়ছিল তাই ভাল লাগছিল ওর। তারাভর্তি আকাশ, পাতাভর্তি গাছের সঙ্গে সঙ্গে টিউব-রেলের জন্যে খোঁড়া মাটির পাহাড়ও

ওর ভাল লাগছিল। গেয়টের একটা কথা আছে, আঠারো বছর বয়েসটা এমনই একটা বয়েস যে, সেই বয়েসে সবাইকেই আঠারো বছরের বলে মনে হয়। কথাটার ভেতরের মানে অনুপ এই প্রথম ধরতে পারল। আঠারো বছর বয়েসটা ও অবশ্য অনেক আগে পেছনে ফেলে এসেছে, তবে বুঝতে পারল ওই বয়েসের মতো আর একটা বয়েস প্রত্যেকের জীবনে একবার অন্তত আসে। যখন আসে তখন বোধহয় সবাইকে, সবকিছুকে ঠিক এইরকম করে ভাল লাগে!

গাড়ি গ্যারেজ করে অনুপ শিস দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকল। বসার ঘরের বাইরের দেয়ালে ছিল মাকড়শা। বেশ খুঁটিয়ে অনুপকে দেখে নিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, আজ তোমাকে কেমন যেন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে।'

অনুপ হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ অন্যরকম, একেবারে অন্যরকম। আমি আগাগোড়া পালটে গেছি।'

হেঁয়ালি-মার্কা কথায় মাকড়শা একেবারেই কৌতূহলী হল না। ঠাণ্ডা গলায় শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কীরকম ?'

বসার ঘরের বাইরের করিডরে দুটো ফ্যান্সি বেতের চেয়ার আছে, তার একটায় গা ছড়িয়ে বসে অনুপ বলল, 'আমি বোধহয় প্রেমে পড়ে গিয়েছি।'

এত বড় তথ্য জানার পরেও মাকড়শার ঠাণ্ডা গলা গরম হল না। একই ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে ?'

'শ্রাবন্তী।'

'শ্রাবন্তী কে ?'

'আপনার মনে আছে কি, সেই যে একটা মেয়ে একবার রোগা হওয়ার জন্যে এখানে রাত্তিরে ছিল।'

'মনে পড়ছে। আমি তখনই জানতাম এইরকম একটা, কিছু হবে।'

অনুপ অবাক হয়ে বলল, 'সে কী! কী করে জানলেন? আজকের আগে পর্যন্ত আমিই তো জানতাম না!'

কোনো কথা না বলে মাকড়শা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। অনুপ জানে মানুষের প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে মাকড়শার ধারণা ভাল নয়। ওসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে মাঝেমধ্যে। বলে, প্রেমের অমরত্ব ব্যাপারটা হাস্যকর। সবকিছুই মরে, সব চাইতে আগে মরে প্রেম। মাকড়শাদের সমাজে নাকি কয়েক হাজার বছর আগে প্রেম নিয়ে কবিতা-টবিতা লেখা হত। এখন ওদের কেউ কেউ হাসি-ঠাট্টা করার সময় ওই সব কবিতার দু-একটা লাইন বলে।

মাকড়শা দ্রুত কয়েক পা দৌড়ে গেল দেওয়ালে, এবার ও নিজের ঘরে চলে যাবে। যাবার আগে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'যাই করো না কেন, কাজকর্মের ক্ষতি কোরো না। প্রেমে পড়াটা পাগলামো, আর ডুবে যাওয়াটা বোকামি।'

শ্রাবন্তীসমেত আস্ত ময়দানটা অনুপের চোখের সামনে ভাসছিল, বুকের

মধ্যে এখনো সেই বিচিত্র শিরশিরানি। ও থমথমে গলায় উত্তর দিল, 'আপনি কিন্তু এক নম্বরের সিনিক।'

মাকড়শা মৃদু হেসে বলল, 'তোমাদের কাছে যা সিনিসিজম আমাদের কাছে তাই কাণ্ডজ্ঞান।'

অনুপ বেশ তাল ঠুকে তর্কের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে সে সুযোগ না দিয়ে মাকড়শা বলল, 'ও ভাল কথা, সেক্রেটারি অনেকক্ষণ বসেছিল। একটা নোট রেখে গেছে। কাল দুপুর দুটোর সময় দেশের কাপড়কলের মালিকরা মেমোরেণ্ডাম নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে অফিসে।'

'কেন?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল অনুপ।

'কেন আবার, তোমরা ওদের পথে বসিয়েছ অথচ ওরা একটু কান্নাকাটি করে রিলিফ চাইবে না।'

অনুপ এবার চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এলে কী বলব বলুন তো?'

মাকড়শা হেসে বলল, 'এ-সব সামান্য ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে? যা ভাল বোঝ তাই করবে।'

'এটা কি সামান্য ব্যাপার হল?'

'তা নয়ত কি? সারা পৃথিবীর কাপড়ের একচেটিয়া বাজার তোমার হাতে। দেশের বাজারের সমস্যা তো সেই হিসেবে কোনো সমস্যাই নয়।'

এ-কথার কোনো জবাব দিতে পারল না অনুপ। মাকড়শা চলে গেল নিজের ঘরে।

অন্যান্য দিন এই ধরনের কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনুপ সমাধানের পথ নিয়ে ভাবত, কিন্তু আজ আর এ-সব নিয়ে কিছুই ভাবতে ইচ্ছে করল না ওর।

রাত্রে বাড়ি ফেরার পরে কিছু রুটিন-কাজ থাকে অনুপের, সেগুলো সেরে যখন ও বিছানায় এসে শোয় তখন ঘুমে ওর চোখ ভেঙে আসে। কিন্তু আজ ঘুম কোথায়? চোখ বোজার পরেও চোখের মধ্যে ভাসতে লাগল শ্রাবন্তীর অসামান্য মুখ!

ছয়॥

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে সারাদিনের প্রোগ্রাম ব্রিফ করে সেক্রেটারি। ঠাসা সূচী। আজকের শেষ প্রোগ্রাম সন্ধে সাতটায়, লিবারেটেড উইমেন'স গ্রুপ-এর ফ্লাওয়ার শো দেখা এবং ওই গ্রুপের সঙ্গে ডিনার খাওয়া।

অনুপ বিরক্ত হয়ে বলল, 'শেষ প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করে দিন।'

সেক্রেটারি পেনসিল দিয়ে মাথার পেছনের চুল চুলকে বলল, 'এর আগে এই গ্রুপের পাঁচটা প্রোগ্রামে আপনি যাননি, এবার কিন্তু কথা দিয়েছেন যাবেনই।'

অনুপ একটু বিব্রত হয়ে উঠল। 'ঠিক আছে, দেখা যাক।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল কর্মব্যস্ত দিন আর ঘড়ির সঙ্গে দৌড়নো। এক-একসময় অনুপের মনে হচ্ছিল নিশ্বাস ফেলাটাও ও বোধহয় ঘড়ি ধরে সারছে।

কাপড়কলের মালিকরা দুটোর কিছু আগেই কনফারেন্স রুমে এসে জড় হয়েছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ গুজরাটি, সিন্ধি, মাড়োয়াড়ি আর পাঞ্জাবি মালিকরা হাতে স্মারকপত্র নিয়ে বসেছিল মুখ চুন করে। ঠিক দুটোর সময় কনফারেন্স রুমে অনুপ ঢুকতেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল প্রতিনিধি-দলটা। অনুপ বসার পরে ওরাও বসল।

কারও মুখে কোনো কথা নেই। অনুপ আবার ঘড়ির দিকে তাকাতেই কাপড়কলের গুজরাটি মালিকটি খুব বিনীতভাবে স্মারকপত্র এগিয়ে দিল অনুপের দিকে। স্মারকপত্রে কী লেখা আছে অনুপের জানা, ও পড়ার ভান করে মনে মনে বেশ মজা পাচ্ছিল। কয়েক মাস ধরে এই লোকগুলো দাঁত-নখ বার করে ওর নামে নিন্দে-মন্দ করে বেড়িয়েছে। ওর ব্যবসা নাকি ধোঁকাবাজির ব্যবসা। দেশের বাজার ধরার ক্ষমতা নেই ওর। কিন্তু চাকা ঘুরে গেছে ইতিমধ্যে। সেই লোকগুলোর চকচকে মুখ এখন কালো। ঈর্ষাকাতর মালিকরা আজ ওর কৃপাপ্রার্থী।

স্মারকপত্রে চোখ রেখেই অনুপ বলল, 'আপনাদের জন্যে কী করতে পারি বলুন?'

বলবার জন্যে উশখুশ করে উঠল গোটা প্রতিনিধিদলটা, তারপর মুখ খুলল মাড়োয়াড়ি মালিক। 'আপনি আমাদের একটু দেখেন, আমাদের কারবার তো বিলকুল বন্ধ হয়ে গেছে।'

অনুপ হেসে বলল, 'তার জন্যে আমি কি করতে পারি? দেশের লোক ভাল কোয়ালিটির কাপড় শস্তায় কিনতে চায়, আপনারা সেই ধরনের কাপড় বানান।'

এবার উত্তর দিল পাঞ্জাবি লোকটি। 'ইমপসিবল। আপনার সঙ্গে কম্পিট করার হিম্মত দুনিয়ায় কারো নেই।'

অনুপের বলতে ইচ্ছে করছিল, তাহলে এতকাল কাদা ছেটাচ্ছিলে কেন? কিন্তু মুখে বেশ ভদ্রভাবে বলল, 'ঠিক আছে, এখন বলুন আপনাদের জন্যে আমি কী করতে পারি?'

সিন্ধি মালিকটি এই প্রথম কথা বলল, 'সে আপনি জানেন, তবে একটা কিছু উপায় বাতলে দিন যাতে আমরা কারবার করে খেতে পারি।'

'তাহলে তো আমাকে কারবার তুলে দিতে হয়, আপনারা কি তাই চান ?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধি দলটি 'ছিঃ-ছিঃ, রাম-রাম্, উই ডিডন্ট্ মীন দ্যাট রিয়েলি' ইত্যাদি বলে উঠল একসঙ্গে।

কাপড়কল মালিকদের মনের ওপর আরো কিছুক্ষণ চাপ সৃষ্টি করার পরে অনুপ বলল, 'আপনারা দেশের লোক, আপনাদের ভাল আমি চাই। ঠিক আছে, ওয়েস্টার্ন জোনে আমি ব্যবসা করব না, আপনারা ওই জোন্টা নিয়ে থাকুন।'

সম্পূর্ণ অভাবিত এই প্রস্তাবে মালিকরা ধন্য-ধন্য করে উঠল, তারপর ঠাণ্ডা পানি খেয়ে হাসি মুখে বিদায় নিল এক-এক করে।

আধ ঘণ্টা বাদে নিজের চেম্বারে ফিরে এল অনুপ। টেবিলে ওর জন্যে একটা ফোন কল অপেক্ষা করছিল। শ্রাবন্তীর ফোন। সেই সুরেলা গলা কানে যেতেই অনুপের এতক্ষণের সব ক্লান্তি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। শ্রাবন্তী বলল, 'কাল রাতে আমি একদম ঘুমোতে পারিনি।'

'কেন ?'

'জানি না।'

না-জানা কোনো ব্যাপার যে এত মধুর হতে পারে অনুপ এই প্রথম জানল। একটু থেমে ও বলল, 'কাল রাত্তিরে আমারও ঘুম আসছিল না কিছুতেই।'

'কেন ?'

এবার শ্রাবন্তীর ওই উত্তরটাই দিল অনুপ, 'জানি না।'

শ্রাবন্তী পালটা কোনো উত্তর দিতে পারল না সঙ্গে সঙ্গে। সেই ফাঁকে অনুপের টেবিলের আর একটা ফোন বেজে উঠল। পি বি এক্স জানাল, জরুরি ওভারসীজ কল্। অনুপ বলল, 'সেক্রেটারিকে কথা বলতে বলুন, আমি ব্যস্ত আছি।'

শ্রাবন্তীর সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত থাকল অনুপ আরো পনেরো মিনিট। এই পনেরো মিনিটে কোম্পানির গোটাকয়েক জরুরি কাজের ক্ষতি হল, কিন্তু তার জন্যে একটুও খারাপ লাগল না অনুপের। বরং নানা দরকারি কাজের মধ্যে ওর বারবার মনে হচ্ছিল আগামীকালের বিকেল পাঁচটা বাজতে আর কত দেরি আছে ! কাল ওই সময় শ্রাবন্তীর সঙ্গে দেখা হবে আবার !

সন্ধে সাড়ে-ছটায় সেক্রেটারি বলল, 'স্যার, সাতটার সময় ফ্লাওয়ার-শো, তারপর ডিনার, যাবেন তো ?'

অনুপ একটু দোনামনা করে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন।'

কাছেই প্রদর্শনী। ক্যামাক স্ট্রিটের একটা বাগান ফুলে-ফুলে ভরে গিয়েছিল। ফুলের যেমন আকার তেমনি রূপ। তার পাশে রূপসী মেয়েদের ঝাঁক। প্রত্যেকেই 'লিবারেটেড উইমেন্স গ্রুপের' সদস্য। গ্রুপের নেত্রী

মিসেস সাকসেনা সদলে অভ্যর্থনা জানালেন অনুপকে। অনেকেই বলল, মিস্টার রে-কে তাদের মধ্যে পেয়ে তারা যে কী খুশি হয়েছে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না!

প্রদর্শনী দেখার পরে ফুলের মতো মেয়েরা অনুপকে ফুলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে ছোট্ট একটি সভা করল। মিসেস সাকসেনা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রুপের ব্রোশিওর উপহার দিলেন অনুপকে। ব্রোশিওরের প্রথম পৃষ্ঠাতেই অনুপের পাতাজোড়া ছবি আর বাণী।

মিসেস সাকসেনা সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতায় বললেনঃ মিস্টার রে-র কাছ থেকে আমাদের গ্রুপ সব সময় সবরকম সাহায্য পেয়েছে। তিনি না থাকলে আমাদের গ্রুপ আজ এত বড় হতে পারত না। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি মিস্টার রে-কে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা ধন্য।

ক্ল্যাপ্ ক্ল্যাপ্ ক্ল্যাপ্। ছন্দের তালে হাততালি দিল ধনীঘরের সুন্দরীরা। বক্তৃতার উত্তরে ধন্যবাদ জানাল অনুপ।

তারপরেই বুফে ডিনার। গ্রুপের এক ঝাঁক মেয়ে অনুপের সঙ্গে ভাব জমাবার তাল করছিল, কিন্তু মিসেস সাকসেনা খুব কায়দা করে ওদের কাটিয়ে দিয়ে অনুপকে প্রায় টেনে নিয়ে গেলেন বাগানের ধারের দিকে একটা টেবিলে।

মিসেস সাকসেনা ওদের গ্রুপের কাজকর্মের ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছিলেন অনর্গল। ওদের গ্রুপ রিটার্ডেড বাচ্চাদের জন্যে কত ভাল-ভাল কাজ করেছে, ক্রিয়েটিভ আর্টস আর ডগ্-শোয়ের জন্য ওদের স্কীমগুলো কত এফেক্টিভ, সোসায়েটির সোশিও-ইকনোমিক প্যাটার্নে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে সার্ভে করছে ওদের গ্রুপ, এ-ছাড়া প্রতি মাসেই আছে নানান বিষয়ের ওপর সেমিনার আর প্যানেল ডিসকাশান।

একটানা এইসব বকবকানি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল অনুপ। মনে মনে বলছিল, এত ধানাই-পানাই না করে বল্ না বাবা আর কত টাকা ডোনেশন দিতে হবে? তাড়াতাড়ি বললে তোরও কাজ মিটত আমাকেও ক্লান্ত হতে হত না।

মিসেস সাকসেনা বোধহয় অনুপের অন্যমনস্ক ভাবটা লক্ষ্য করেছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে বললেন, 'একি! আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না!'

ফিস-রোলটা খুব সুস্বাদু, কিন্তু বক্তৃতার তোড়ে এক কামড়ের বেশি অনুপের আর খাওয়াই হয়নি। মিসেস সাকসেনার কথায় অনুপ আর একটা ছোট কামড় দিল রোলে।

একটু পরেই ড্রিংক্স্ সার্ভ করা হল টেবিলে। এটা অনুপের ভাল লাগে না, কিন্তু ব্যবসার সুবাদে খেতে হয় মাঝেমধ্যে। এখন ও গ্লাস টেনে নিল মিসেস

সাকসেনার বক্তৃতার ঝাঁজ এড়াবার জন্যে। তবে একটু পরেই বুঝতে পারল গ্লাস হাতে নিয়ে ভুল করেছে। মিসেস সাকসেনা একজন হার্ড ড্রিংকার। দুটো পাত্তর দ্রুত গলায় ঢেলে দিয়ে গদগদ কথা শুরু করে দিলেন। আর প্রতি তিনটে কথার শেষে একটা করে 'আপনাকে আমি বোর করছি না তো ?'

অনুপ যান্ত্রিক নিয়মে 'না-না', 'কি আশ্চর্য' 'খুব ভাল লাগছে শুনতে' এই সব বলে যাচ্ছিল। কথাগুলোয় আর মদের প্রভাবে মিসেস সাকসেনার উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে।

খুব লম্বা একটি বিলিতি সিগারেট ধরিয়ে মিসেস সাকসেনা বললেন, 'আমরা লিবারেটেড উইমেনস গ্রুপ, আমরা সবদিক থেকে লিবারেশন চাই। কোনোরকম বাধাই আমরা মানব না। কোনো ইনহিবিশন বা ট্যাবু আমাদের নেই। আমরা মুক্ত, মানে মুক্ত, মানে ইন অল সেন্সেস।'

বেশ ভালরকমের নেশা ধরে গেছে মিসেস সাকসেনার ! ফ্যাসাদে পড়ার জন্যে নিজের বোকামিকে দায়ী করল অনুপ। কী কুক্ষণেই যে এই মহিলার সঙ্গে ড্রিংক্সের টেবিলে বসেছে ! মহিলার বয়েস চল্লিশের আশেপাশে। দেখে বোঝা যায় এককালে পরমাসুন্দরী ছিলেন। এখন অবশ্য নিজের সৌন্দর্যকে ধরে রাখার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। বেশ লম্বা, শরীরে সামান্য বাড়তি মেদ, গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে মিসেস সাকসেনা বললেন, 'আপনি আমার একটা বিরাট ক্ষতি করেছেন মিস্টার রে।'

'ক্ষতি !' অনুপ প্রায় চমকে উঠল।

মিসেস সাকসেনা নিজেকে শুধরে নিয়ে সামান্য টেনে টেনে বললেন, 'আমি বলছি না যে আপনিই আমার ক্ষতি করেছেন, তবে আপনার জন্যে আমার বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে গেছে, ইট্স্ ট্রু।'

অনুপের বিস্ময়ের ভাবটা একবিন্দু কমল না। 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু পরিষ্কার করে বলবেন ?'

বিলিতি সিগারেটের ছাই চট করে ভেঙে পড়ে না, মিসেস সাকসেনা সিগারেটের মাথায় জমে-ওঠা ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার স্বামী ভীষণ সেকেলে, আর আমি অত্যন্ত মড্, আমাদের মধ্যে কোনোরকম আণ্ডার-স্টাণ্ডিং নেই, ইন ফ্যাক্ট কখনোই ছিল না।'

একেবারেই ঘরোয়া কথা, এর কী উত্তর হওয়া উচিত, বুঝতে পারল না অনুপ।

মিসেস সাকসেনার সিগারেটের লম্বা ছাই এবার লনের সবুজ ঘাসের ওপর ভেঙে পড়ল। গ্লাসে আর একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে আবার মুখ খুললেন তিনি। 'কিন্তু আমার কোনো প্রবলেম ছিল না এতদিন। মাই হাজব্যান্ড ওয়াজ আ

বিগ লাম্প্ অব ফ্লেশ। এত মোটা যে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা পর্যন্ত ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার চলাফেরা কিংবা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায় তাই ওর বাধা দেবার কোনো সাহস ছিল না এতদিন। বাট দ্য সীন ইজ চেঞ্জড্ নাও। ও এখন দারুণ ডিমান্ডিং হয়ে উঠেছে। সব ব্যাপারে একটা গোঁড়া লোকের কথা শুনে চলা কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো? আর এর জন্যে আপনি দায়ী, ইট ইজ বিকজ অব্ ইউ।'

'আমি! আমি এর মধ্যে কোত্থেকে আসছি?' আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল অনুপ।

মিসেস সাকসেনার বড়-বড় দুটো চোখের মধ্যে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই আভা বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনিই তো দায়ী, আপনার একটা কারখানায় আমার স্বামী ফ্যাট শেড করে এসেছে। নাও হি হ্যাজ বিকাম আ স্লিম চ্যাপ।'

বহুক্ষণ বাদে মন খুলে হাসল অনুপ। ও, এই ব্যাপার! গোটা দেশটা ধনী হয়ে ওঠার আগে বিদ্যুৎসংকট ছিল সর্বত্র। তখন যেমন 'লোডশেডিং' কথাটা লোকের মুখে মুখে ঘুরত, এখন তেমনি 'ফ্যাট-শেডিং'। চর্বি বেড়ে উঠলেই কারখানায় যাও। চর্বি কমিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক হবে আবার পয়সাকড়িও আসবে। এক ঢিলে দুই পাখি।

হাসিটা অনুপের থামতেই চাইছিল না, কোনোমতে থামিয়ে বলল, 'এ তো ভাল খবর মিসেস সাকসেনা, এর জন্যে আপনার তো খুশি হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

অনুপের কথা আর হাসিতে ভদ্রমহিলা বেশ আহত হয়েছিলেন। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর অনুপের চোখে চোখ রেখে বললেন, আমি লিবারেটেড উইমেন'স গ্রুপের প্রেসিডেণ্ট। বিশ্বাস করুন মিস্টার রে, দিস ইজ নো ফ্যাশান। আমরা ফ্রীডম চাই, সব দিক থেকে ফ্রীডম। আমরা ওয়ান-ম্যান ওয়ান ওম্যান থিয়োরিতে বিশ্বাস করি না। উই বিলীভ ইন ফ্রী সেক্স। সেকেলে মানুষদের সেকেলে ধ্যান-ধারণাগুলো ভেঙে ফেলার সময় এসে গেছে এখন। ধরুন, ইফ ইউ স্লীপ উইথ মি টুনাইট, হোয়াট'স রং ইন ইট?'

কোনো প্রসঙ্গ বেশি দূর গড়াতে দিতে না চাইলে ক্রমাগত সায় দিয়ে যেতে হয়। সেই হিসেবে সায় দিতে গিয়ে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল অনুপ। বলে কী? মিসেস সাকসেনার বয়েস একটু বেশি হলেও যৌবনের অনেকখানি এখনো ধরে রেখেছে সযত্নে। স্কচ হুইস্কি এই মুহূর্তে ওর শরীরে বাড়তি লাস্য এনে দিয়েছে। মহিলার প্রচ্ছন্ন প্রস্তাবের সুতো ধরে অনুপ কল্পনা করল কোনো এক হোটেলের বিছানায় ও শুয়ে আছে এই লাস্যময়ীটির সঙ্গে।

হুইস্কির সামান্য প্রভাব অনুপের ওপরেও পড়েছিল। ও কল্পনাটাকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল লাস্যময়ীর জায়গায় ফুলের মতো শ্রাবন্তী।

মিসেস সাকসেনা বোধহয় পছন্দসই উত্তর পাওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কী জবাব দিত অনুপ নিজেও জানে না, কিন্তু মাঝখানে শ্রাবন্তী এসে সব গোলমাল করে দিল। গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিয়ে অনুপ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আপনার স্বামীকে ভালবাসেন ?'

পরিষ্কার বোঝা গেল এই মুহূর্তে এই প্রশ্নটা খুব অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে মিসেস সাকসেনার। কিন্তু হার মানবার পাত্রী নন লিবারেটেড উইমেনস গ্রুপের নেত্রী। ওয়েটারকে হাত নেড়ে টেবিলে আরো ড্রিংক্স দেবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'কেন ভালবাসব না, নিশ্চয়ই ভালবাসি।'

অনুপ যেন হাতে পিন নিয়ে বসে ছিল, সেটা ফুটিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'তাই যদি হয়, তবে আর একজনের সঙ্গে শুতে আপনার খারাপ লাগবে না ?

'কেন লাগবে ? খারাপ লাগাটা তো গোঁড়ামি, কুসংস্কার, এজওল্ড বিলিফ। এর প্রতিবাদেই তো এখন সারা পৃথিবীতে গ্রুপ সেক্স, ওয়াইফ সোয়াপিং, লিভিং টুগেদার ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ স্বাধীনতা চায়, সব রকমের স্বাধীনতা।'

মিসেস সাকসেনার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে নিয়ে অনুপ বলল, এসব কতটা সত্যি আমি জানি না, জানি না বলেই তর্কের মধ্যে ঢুকতে চাইছি না। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, স্বামী-স্ত্রী কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্কটা কি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ? এর মধ্যে তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে তারা এর থেকে মুক্তি চাইবে।'

মিসেস সাকসেনা লাইটার জেবলে অনুপের সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'ফেথফুলনেস, অ্যালিজিয়েন্স, গোঁড়া লোকদের বানানো কথা। কনজারভেটিভ সোসায়েটির ওপর ওগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা তার থেকে মুক্তি চাই। স্যোশিওলজিস্টরা আজ এ-ব্যাপারে একমত যে, এভরি ম্যারেড ম্যান ওয়ান্ট্স টু স্লিপ উইথ নন্ওয়াইভ্স, অ্যান্ড' এভরি ওয়াইফ ওয়ান্টস টু বি রেপ্ড্ বাই নন্-হাজ্ব্যান্ড্স্।'

'সো ওয়াট ?' অনুপ সামান্য উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারপর আস্ত সিগারেটটা অ্যাশ্ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, 'স্যোশিওলজিস্টরা এ-কথাও বলে, প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষ জীবনে একবার-না-একবার গভীরভাবে আত্মহত্যা করার কথা ভাবে। সেটাও তো মনের ইচ্ছে। মনের ইচ্ছে সবাই যদি কাজে লাগাত, ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াত বলুন তো ?'

এ-কথার উত্তরেও মিসেস সাকসেনার হয়ত কিছু বলার ছিল, কিন্তু পৃথিবীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী মিস্টার রে-কে হঠাৎ সামান্য উত্তেজিত হতে দেখে চেপে গেলেন একদম। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবেগ সংগ্রহ করে অনুপের হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ভরাট গলায় বললেন, 'মিস্টার রে, ইউ আর আনলাইক আদার ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস। টু হিয়ার ইউ টক্, আই মাস্ট সে, ইজ ইরুডিশন্। চলুন না কাছেই আমার একটা অ্যাপার্টমেণ্ট আছে, ইউ উইল গেট প্লেনটি অব সলিচিউড দেয়ার, আমরা দুজনে মিলে কিছুক্ষণ গল্প করব, দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়াং।'

অনুপ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দশটা বেজে গেছে। কখন যে এত রাত্তির হয়ে গেছে টেরই পায়নি। সামান্য উঁচু গলায় বলল, যেতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম মিসেস সাকসেনা, কিন্তু দুঃখিত, কাল ভোরে আমার এক বিদেশী বন্ধুকে সি, অফ করার জন্যে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। আচ্ছা, গুড নাইট।'

যে-কোনো পার্টিতেই অনুপ সৌজন্য, সামাজিকতা মোটামুটি মেনে চলে, কিন্তু আজ ও একটু তাড়াহুড়ো করেই বেরিয়ে পড়ল এখান থেকে।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ছুটে চলেছিল দ্রুতগতিতে। খোলা জানলায় ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু এই ঠাণ্ডা হাওয়াতেও অনুপের অস্বস্তি কাটতে চাইছিল না একটুও। অস্বস্তির কারণটা হল, এরকম অবস্থার মধ্যে অনুপ আগে কখনো পড়েনি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা ওর অনেক হয়েছে, কিন্তু সে-সবের সঙ্গে আজকের এই ঘটনার কোনো মিল নেই। দীর্ঘকাল ধরে সযত্নে লালিত কোনো বিশ্বাসবোধে ধাক্কা লাগলে কি এইরকম হয়? ভালবেসে একজনের প্রতি বিশ্বাসী থাকাটা কি হাস্যকর? কুসংস্কার? গোঁড়ামি?

বিপরীত স্রোত অনুপের মাথার মধ্যে আছড়ে পড়ছিল ক্রমাগত। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিল না ও, কিন্তু বাড়ি পৌঁছে গেল তাড়াতাড়ি।

দেয়ালের লুকনো আলোর পাশে বসেছিল মাকড়শা। অনুপের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'কী ব্যাপার, খাওয়া-দাওয়া কেমন হল?'

'ভাল।'

'বক্তৃতা-টক্তৃতা দিলে?'

'না, শুধু থ্যাংক্‌স-গিভিং…।'

অনুপ মাকড়শার দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারল, মাকড়শা ওকে বেশ খুঁটিয়ে দেখছে। একটু পরে মাকড়শা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, আজ এত চুপচাপ কেন?'

অনুপ হাত দিয়ে নিজের কপালটা চেপে ধরল, 'না, খুব মাথা ধরেছে।'

মাকড়শা সস্নেহে বলল, 'চোখেমুখে একটু ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে শুয়ে পড়ো চটপট। আজ আর কাজ নিয়ে বোসো না।'

মাকড়শা নিজের ঘরে চলে যাবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ অনুপ একই ভঙ্গিতে সোফায় বসে থাকল। মাথার মধ্যে সেই বিপরীত স্রোতগুলো এখনো আছড়ে পড়ছে সমানে। মাথা ওর আদপেই ধরেনি, এখন গল্প করতে ইচ্ছে করছিল না, তাই মিথ্যে কথা বলেছে। মাকড়শা হয়ত ধরেও ফেলেছে মিথ্যেটা। কারণ, মাকড়শাই ওকে ডিপ্লোমেসি শিখিয়েছে। কিছু পরিমাণ কূটনীতি বিজনেস-ম্যাগনেট্‌দের শিখতেই হয়। কোন্ পরিস্থিতিতে নন্-কমিটাল থাকতে হয়, কোন্ অবস্থায় ডিপ্লোমেটিক ইলনেসের আশ্রয় নিতে হয়—এইসব। যেমন, কাউকে এড়াতে চাইলে অনায়াসে বলতে পারো, খুব মাথা ধরেছে।

ককটেল পার্টি থেকে ফিরলে বিছানায় শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে অনুপ, কিন্তু আজ কিছুতেই ওর ঘুম আসছিল না। চোখের সামনে কেমন যেন পালা করে ভেসে উঠছিল মিসেস সাকসেনা আর শ্রাবন্তীর মুখ। কানের ওপর ঝমঝম করে বাজছিল একবার শ্রাবন্তী একবার ওই মহিলার কথাগুলো।

॥ ৭ ॥

অসম্ভব খাটনির মধ্যে কেটে গেল একটা মাস। এই এক মাসের মধ্যে সতেরো দিন অনুপ বিদেশে ছিল। লণ্ডন, প্যারিস, জুরিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, রোম, টোকিও আর নিউ ইয়র্কে ওদের কোম্পানির শো-রুম উদ্বোধন করতে হয়েছে। ব্রাসেল্‌সে একটা টেক্সটাইল সেমিনারে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তাছাড়া ছিল লাঞ্চ, ডিনারের একগাদা নেমন্তন্ন, এই ক'মাসে সারা পৃথিবী অনুপ এতবার ঘুরেছে যে, প্রথম বিদেশ-সফরের সেই রোমাঞ্চের ছিটে-ফোঁটাও এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে টিউব কিংবা মেট্রো রেলের এসকালেটর আর এয়ারপোর্টের লম্বা কনভেয়ার বেল্টে চেপে যাবার সময় এবার ওর বিচিত্র এক অনুভূতি হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এ যাত্রার বুঝি আর শেষ নেই। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণতা আর অবসাদ প্রচণ্ড ভাবে চেপে ধরেছিল ওকে।

অল্প সময়ের জন্য হলেও এই একমাসে অনুপের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে শ্রাবন্তীর। প্রথম দর্শনেই ওরা বোধহয় প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, সেই প্রেমের কথা পরস্পরকে জানিয়েছে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম দর্শনে। তারপরের কয়েকটি দর্শন, শ্রবণ আর স্পর্শ প্রেমকে অত্যন্ত গাঢ় করে তুলেছে। অনুপ এখন আর আগের মতো দিনরাত্তির কাজে ডুবে থাকতে পারে না, বিদেশে গেলে বিরহযন্ত্রনায় কষ্ট পায়। ওর প্রেমে গভীর প্রেমের সব লক্ষণ স্পষ্ট, কিন্তু একটা কাঁটা মাঝেমধ্যে খচখচ করে ফোটে। সেই কাঁটাটা ওর মনে বিঁধিয়ে

দিয়েছে মিসেস সাকসেনা। অনুপ প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাঁটাটা তুলে ফেলতে পারেনি। ওর কথাবার্তা তাই মাঝেমধ্যে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে শ্রাবন্তীর।

অনুপ আর শ্রাবন্তী সেদিন রেড রোডের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। দিনের আলো ওদের চোখের সামনে ডুবে গেল একটু-একটু করে। গাছের ঝাঁকড়া মাথায় পাখির কিচিরমিচির। হুশহাশ করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। গাড়ির হেডলাইটের আলো সবুজ ঘাস আর গাছের খয়েরি গুঁড়ির ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছিল বারবার। অন্ধকার আর আলোর ক্রমাগত এই ধাক্কায় একটা আচ্ছন্ন ভাব তৈরি হয়েছিল অনুপের ভেতর। শ্রাবন্তীর হাতটা ও হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আলতো করে চুমু খেল একটা। শ্রাবন্তী বলল, 'কী?'

অনুপের বেশ মজা লেগে গেল, কিসের কী? চুমু খাওয়ার কি কোনো কারণ আছে! নাকি ওর আস্ত প্রশ্নটা হল, চুমু খাওয়ার পরে আর কী? প্রশ্নটা ভেবে নিয়ে অনুপ বলল, 'সব।'

শ্রাবন্তী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী সব?'

অনুপ ওর কাঁধে চাপ দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে আবার বলল, 'সব মানে সব।'

ঠিক এই সময় দ্রুতগামী একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়ল ওদের গায়ে। শ্রাবন্তী কিন্তু একটুও সরল না। না সরে বলল, 'আর কত হাঁটবে? এবার একটু বসি।'

অনুপ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, দিনরাত্তির তো বসে থাকি, হাঁটতে বেশ ভাল লাগছে। চলো না। আর একটু হাঁটি, পরে বসব।'

শ্রাবন্তী একটু নকল রাগ দেখাল—'ধ্যাত্, তোমার শুধু হাঁটা আর হাঁটা! সেদিনের মতো হোটেলের সুইমিং পুলের ধারে বসলে কত ভালো হত বলো তো!'

'এক কাজ করবে, আমাদের কোম্পানি পার্ক স্ট্রিটে নতুন একটা গেস্ট-হাউস বানিয়েছে, চলো ওখানে বসে গল্প করা যাক।'

শ্রাবন্তী প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, 'চলো চলো, দারুণ হবে।'

অনুপ বাঁকা করে হাসল, 'কী দারুণ হবে!'

শ্রাবন্তী ওর কথার ভেতরের অর্থ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে ওকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল সামান্য দূরে পার্ক-করা গাড়ির দিকে।

নির্জন রাস্তায় অনুপের গাড়ির চাকা গড়াতে লাগল। গাড়ি চালাচ্ছিল অনুপ, পাশে ঘন হয়ে বসে ছিল শ্রাবন্তী। সামান্য পথ। গোটা-তিনেক কথা শেষ হবার আগেই চলে এল গেস্ট-হাউসে। অনুপ বলল, 'আমাদের এই গেস্ট-হাউসে তুমিই কিন্তু প্রথম গেস্ট।'

শ্রাবন্তী যখন-তখন চোখে বিস্ময় ফোটাতে পারে, বড়-বড় চোখদুটো আরো বড় করে বলল 'তাই!'

গেস্টহাউসের সামনে ছোট্ট একটা সবুজ লন, দুধারে ফুলগাছের সারি।

গেট খুলে দারোয়ান লম্বা একটা সেলাম ঠুকল। নুড়ি, বেছানো রাস্তায় মচমচে আওয়াজ তুলে গাড়ি এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার পাশে। ছোট্ট একটা হর্ন দিতেই কেয়ারটেকার ছুটে এল। দুধের মতো সাদা, বাহারি গেস্ট-হাউসটা দেখে দুচোখে আর একবার বিস্ময় জড় করল শ্রাবন্তী। 'আহ! কী সুন্দর!'

দোতলা গেস্ট-হাউসের সিঁড়ি লাল টুকটুকে কার্পেটে মোড়া। দোতলার গোটা ফ্লোরেই ম্যাচিং কার্পেট। সিঁড়ির দিকে একই ধরনের দুটো স্যুইট। বাঁদিকের স্যুইটের দরজা খুলে গাঢ় গলায় অনুপ শ্রাবন্তীকে ডাকল, 'এসো।'

একটা সিটিং, একটা রিডিং আর একটা বেডরুম নিয়ে স্যুইট। দারুণ সাজানো ঘরগুলোয় প্রায় ছেলেমানুষের মতো ছুটে ছুটে শ্রাবন্তী যে কতবার বিস্মিত হল, তার আর ঠিক নেই।

অনুপ বলল, 'ভারতবর্ষের সবকটা ক্যাপিটালেই আমরা তিনটে করে এই রকম গেস্ট-হাউস বানিয়েছি। তবে গেস্ট-হাউসেই আমরা সব গেস্টকে রাখি না। বেশির ভাগ গেস্টকেই রাখা হয় হোটেলে।'

শ্রাবন্তী হঠাৎ বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকিয়ে মজার গলায় বলল, 'সব গেস্টহাউসে তুমি কি শুধু আমার মতো গেস্টদেরই আনো।'

একই রকমের মজার গলায় উত্তর দিল অনুপ, 'আনলে কি কোনো দোষ হয়?'

'কক্ষনো না, এতে দোষের কী আছে।'

হঠাৎ অনুপের মনের মধ্যে আটকে-থাকা সেই কাঁটাটা খচখচ করে উঠল। কানের পাশেই যেন লাউডস্পিকারে বেজে উঠল মিসেস সাকসেনার কথাগুলো: চলুন না কাছেই আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, দুজনে বেশ গল্প করা যাবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্লিপ উইথ মি, ইউ ক্যান। সেকেলে গোঁড়ামি, ট্যাবু আমার নেই। আমি ফ্রি-সেক্সে বিশ্বাস করি। কথাগুলো কেমন যেন ভাঙা রেকর্ডে আটকে যাওয়া কথার মতো বারবার আছড়ে পড়ছিল অনুপের কানের ওপর।

অনুপ মনে মনে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে সামান্য নিচু গলায় বলল' 'সত্যি এর মধ্যে দোষের কিছু নেই?'

শ্রাবন্তীর মজা করার ঝোঁকটা এখনো কাটেনি, ঝলমলে গলায় বলল, 'দোষের কী আছে, পুরোটাই গুণের, আর তুমি তো খুব গুণী ছেলে।'

শ্রাবন্তীর কথা আচমকা একটা ধাক্কা মারল অনুপকে। একটা ধাক্কায় আর একটা ধাক্কার জন্ম হয়। অনুপ হিসহিস করে বলল, 'গুণী মেয়ে হতে তোমার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। আমার গেস্টহাউসে আর কারও সঙ্গে রাত কাটাতে পারলে তুমি খুব খুশি হবে, না?'

শুনে শ্রাবন্তীর ঝলমলে মুখটা কালো হয়ে গেল নিমেষে, চোখ ছলছলে।

কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো ? তুমি আজকাল এই ধরনের কথা আমাকে প্রায়ই বলো। কেন ? তোমার ধারণা অভির সঙ্গে আমার এখনো সম্পর্ক আছে ?'

চোখের সামনে পুরো ব্যাপারটা অন্য দিকে ঘুরে যেতে দেখে অনুপ রীতিমত আহত হয়ে বলল, 'ছিঃ ছিঃ কী বলছ তুমি ! বিশ্বাস করো আমি এ-সব ভেবে কিছু বলিনি।'

আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না।'

সম্পূর্ণ অসহায় মানুষের মতো গলা করে অনুপ বলল, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করেই থাকতে চাই।' এই মুহূর্তে আরো অনেককিছু বলতে চাইছিল অনুপ, কিন্তু সঠিক শব্দগুলো কিছুতেই খুঁজে পেল না। বুঝতে পারছিল ও খুব আবেগপ্রবণ আর যুক্তিহীন হয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলাবার জন্যে একটা সিগারেট ধরাল অনুপ।

মিসেস সাকসেনা ওর বিশ্বাসবোধকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। মিসেস সাকসেনাও এক ধরনের বিশ্বাস থেকে কথা বলেছে। কিন্তু কোন্ বিশ্বাসটা ঠিক ? ভালবাসা মানে তো আনুগত্য। আনুগত্য মানে কি শুধু একটিমাত্র শরীরের প্রতি আনুগত্য নয় ? নাকি···

খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে উঠেছে অনুপ। বাধাবন্ধনহীন জীবনযাত্রা কাকে বলে ও চোখ খুলে দেখেছে বিদেশে। কিন্তু ওর রক্তের অনেক গভীরে মেরু-অঞ্চলের বরফের মতো যে সংস্কার জমে আছে তার থেকে মুক্তি পায়নি কখনো, কিংবা পেতে চায়নি···।

সেরা ইনটিরিয়র ডেকরেটরের হাতে সাজানো স্যুইটের চমৎকার আবহাওয়া কেমন যেন দমবন্ধ হয়ে উঠেছিল।

শ্রাবন্তী নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার শরীর খারাপ লাগছে, বাড়ি যাব।'

অনুপ শুনতে পেল ওর নিজের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, 'চলো।'

পথে তেমন কোনো কথা হল না, অনুপ শ্রাবন্তীকে ওদের ফ্ল্যাটের কাছে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল সোজা।

লাউঞ্জের দেয়ালে ছিল মাকড়শা, অনুপের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল। মাকড়শা আজকাল অসম্ভব চুপচাপ হয়ে গেছে। গল্পগুজবে আগের মতো আর আগ্রহ নেই। প্রশ্নের ছোট ছোট উত্তর দেয়, মাঝেমধ্যে উত্তরও দেয় না ! মাকড়শার এই পরিবর্তনটা বেশ কিছুদিন হল অনুপের চোখে পড়েছে। উদ্বিগ্ন হয়ে ও প্রশ্ন করেছে হাজারবার। শরীর খারাপ ? ডাক্তার ডাকব ? আমার কোনো ব্যবহারে কি আহত হয়েছেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি। সব প্রশ্নের উত্তরেই মাকড়শা শুকনো হাসি হেসে ওকে থামিয়ে দিয়েছে। কখনো

বলেছে, 'আরে, বয়স হল, আর কি আমার পক্ষে আগের মতো ছটফটে থাকা সম্ভব ?' কখনো মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে তুলে বলেছে, 'তুমি তো এখন পৃথিবীর দশজন ধনীর একজন, তোমার দেশ তো এখন পৃথিবীর পাঁচটা ধনী দেশের একটা, আর কী, এবার আমাকে ছুটি দাও।'

লাউঞ্জের একটা সোফায় চুপ করে বসে আছে অনুপ। মাথার মধ্যে টুকরো-টুকরো প্রশ্ন, আর সারা শরীরে যাচ্ছেতাই এক অবসাদ। অন্যদিন ও বাড়িতে ফিরেই মাকড়শার কুশলসংবাদ নেয়, আজ আর একটাও কথা বলতে পারল না।

বেশ কয়েক মুহূর্ত কাটার পরে মাকড়শাই কথা বলল, 'শরীর খারাপ ?' প্রশ্নের মধ্যে পুরনো সেই স্নেহের স্বর। স্নেহের গলা কানে যেতেই অনুপ আবার আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল। 'আমার আর কিছু ভাল লাগছে না।'

মাকড়শা হেসে বলল, 'সে কী কথা ! ভাল লাগছে না বললে কি চলবে ? তোমার এখন পৃথিবীজোড়া ব্যবসা !'

'আমি আর ব্যবসা করব না।'

মাকড়শা দেয়াল বেয়ে দ্রুত ওর কাছে এসে বলল, 'কী হয়েছে তোমার ?'

অনুপ শুকনো মুখে হাসার চেষ্টা করে বলল, 'কিছু না।

আবার আগের মতো চুপ করে গেল দুজনে। একটু পরে মাকড়শা বলল, 'সিটিংরুমে তোমার জন্যে দুজন বিদেশী অপেক্ষা করছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছে, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ।'

অনুপ সত্যিই ভুলে গিয়েছিল কিন্তু মনে পড়ার পরেও ও বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করল না। যেমন ভাবে বসেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই বসে থাকল। একটু পড়ে মাকড়শা বলল, 'সাবধানে কথা বোলো, লোক দুটোকে আমার গুপ্তচর বলে মনে হচ্ছে।'

এবাব সজাগ হয়ে উঠল অনুপ। 'গুপ্তচর ! কেন গুপ্তচর বলে মনে হচ্ছে ?'

'লোকদুটোর চলাফেরার, তাকানো এদিক-সেদিক উঁকি মারা রীতিমত সন্দেহজনক। তাছাড়া ওরা প্রায়ই গলা নামিয়ে কোর্ড ল্যাঙ্গোয়েজে কথা বলছিল। আমি ঘরের সিলিংয়ে বসে অনেকক্ষণ ওদের লক্ষ্য করেছি।'

অনুপ পিঠ টান করে বসেছে। সামান্য উত্তেজিত গলায় বলল, 'ঠিক বলেছেন, লোকদুটোকে আমারও খুব একটা সুবিধের ঠেকেনি। ওরা আফ্রিকায় আমাদের কাপড়ের এজেন্সি নিতে চায়। আমি বলেছি, সোল এজেন্সি দিতে পারব না, তবে আপনারা আমাদের হয়ে কাজ করতে পারেন। তার এই-এই শর্ত।' পরিষ্কার কথাবার্তা কিন্তু তারপরেও লোকদুটো নানা অছিলায় আমার সঙ্গে দেখা করে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। সেদিন কথায় কথায় বলল, বাঙালি

রান্নার ওরা খুব সুখ্যাতি শুনেছে। বাঙালি ডেলিকেসি ওরা একটু চেখে দেখতে চায়। আমি ওদের মতলব বুঝতে পেরে আজ রাত্তিরে খাওয়ার জন্যে নেমন্তন্ন করেছি। একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। লোকদুটো খুব মোটা, না?' বলেই খুব ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে মাকড়শার দিকে তাকিয়ে অনুপ হাসল। ইঙ্গিতটা চট করে ধরে ফেলে মাকড়শাও হাসল। অনেকদিন পরে মাকড়শার হাসি দেখে অনুপের বুকের ভার হালকা হয়ে গেল কিছুটা।

জরুরি কাজে আটকে গিয়ে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্যে অনুপ ক্ষমা চাইল অতিথিদুজনের কাছে। সজ্জন অতিথিরা প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল, 'নেভার মাইন্ড, ইট্'স অলরাইট!'

ব্যস শুরু হয়ে গেল দরকারি কথার নামে রাজ্যের গালগল্প।

তারপর যথাসময়ে বাঙালি-খানা। বিরাট আয়োজন। খাবারের মধ্যে ছিল উচ্ছে, কচুশাক, ওলের ডালনা, আলুপোস্ত, মোচার ঘন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। খাবারগুলো সাহেবদুটোর মুখে উঠছিল না, কিন্তু জোর করে খাচ্ছিল আর বিশেষণের তুবড়ি ওড়াচ্ছিল সামনে—একসেলেন্ট, বিউটিফুল, ডেলিশাস ইত্যাদি ইত্যাদি। খাওয়ার শেষে বাংলাদেশী সরবত, সরবতে যথারীতি ঘুমের ওষুধ মেশানো। তারপর বিছানায় পড়ামাত্তর ওদের নাক ডাকতে শুরু করে দিল।

ঘুমোবার পরেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মাকড়শা। তারপর সাহেব দুটোর চর্বি থেকে মনের সুখে রকমারি ডিজাইনের একগাদা কাপড় বুনে ফেলল। মোটাসোটা অতিথিদুজন দেখতে দেখতে রোগা টিঙটিঙে হয়ে গেল।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার পরে ওদের সে কী অবস্থা! নাইটস্যুট পরা অবস্থাতেই পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়!

সাহেবদের চর্বি থেকে বোনা কাপড়গুলো অসম্ভব উজ্জ্বল। এটা কেমন করে হল? জিজ্ঞেস করতেই মাকড়শা বলল, 'হবেই তো, ভাল চর্বি হল ভাল র'মেটিরিয়াল।'

দুপুরে সাহেবদের হোটেলে ফোন করল অনুপ। কিন্তু ওদের পেল না। ওরা নাকি সকালের ফ্লাইটেই দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। নিজের মনেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসল অনুপ। কিন্তু উত্তেজনা থিতিয়ে যাওয়ার পরে সেই অবসাদ আবার ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আস্তে আস্তে।

॥ ৮ ॥

মাকড়শার সব কথা ফলে গেল অক্ষরে অক্ষরে। পরিকল্পনা রূপায়ণের যে সময়সীমা ছিল তার অনেক আগেই সম্পূর্ণ হল সব। ভারতবর্ষ এখন

অর্থ আর সম্পদে পৃথিবীর মাথায়। জাতীয় আয় অকল্পনীয়। মাথা-পিছু আয় অকল্পনীয়। প্রতিটি খাতে অভাবনীয় বিনিয়োগ। উপযুক্ত খাদ্যপুষ্টি পেয়ে ভারতের সব ছেলেমেয়েই এখন বেশ লম্বা-চওড়া, কারও গায়েই বাড়তি চর্বি নেই। প্রত্যেকেরই মাথা খুব সাফ। দেশে বিজ্ঞানী এবং শিল্পীর সংখ্যা বেড়ে গেল হু-হু করে। বিশ্বশান্তি এবং বিশ্ব-অশান্তির ব্যাপারে ভারতবর্ষের কথাই এখন শেষ কথা।

ভারতের এই অভাবনীয় সমৃদ্ধি দেখে অর্থনীতিবিদরা তাদের অনেকগুলো প্রচলিত থিয়োরিকে বাতিল করে দিয়েছে। অনুপ রায়ের 'কম্প্রিহেনসিভ মর্ডানাইজেশন প্রোগ্রাম' এখন একটি নতুন তত্ত্ব। এই তত্ত্বের আওতায় আছে কৃষি, শিল্প, জাতীয় সম্পদ, নতুন ট্যাক্স-স্ট্রাকচার, এক্সপোর্ট প্রোমোশন, কোয়ালিটি কণ্ট্রোল, আনম্যাচিং গ্রোথ পারফর্মানস্, বিনিয়োগ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তত্ত্বের সফল রূপায়ণের ফলে ভারতবর্ষের প্রতিটি পরিবারের এখন নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, টি ভি সেট, রেফ্রিজারেটর, ইলকট্রিক ক্লিনার ইত্যাদি আছে। ভারী শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে ভারত। ব্রিটিশ ইয়ার্ডে একটা জাহাজ তৈরি হতে সময় লাগে ১৯ মাস। ওই মাপের জাহাজ বানায় জার্মানি ১৩ মাসে, সুইডেন ৯ মাসে, জাপান ৮ মাসে। সে ক্ষেত্রে ভারতের সময় লাগে মাত্র ৩ মাস। শুধু সময়-সংক্ষেপই নয়, ভারতের মতো এত নিখুঁত কাজও আর কোনো দেশ করতে পারে না। ইলেকট্রনিক শিল্পে ভারতের অগ্রগতি বিস্ময়কর। অনুপের অনুরোধে ভারত-সরকার এই শিল্পে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

সরকারি প্রশাসন এখন পরিস্রুত জলের মতো, কোথাও এক কুচি নোংরা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমলাদের কর্মতৎপরতা বিস্ময়কর। যে কাজ হেঁটে করলে চলে, সে কাজ তারা দৌড়ে সারে। 'লাল ফিতে' কথাটা এখন অপ্রচলিত শব্দভাণ্ডারে পাকাপাকি ভাবে ঢুকে গেছে। দেশের উন্নতির দিকে চোখ ফেরালে নতুন ভারতের প্রাণপুরুষ অনুপ আগে এক ধরনের তৃপ্তি পেত, কিন্তু এখন আর পায় না। পুরনো সেই অবসাদ, ক্লান্তি আর বিচিত্র এক শূন্যতা ওকে মারাত্মকভাবে চেপে ধরে। মাকড়শারও একই অবস্থা। ওর চেহারায় বয়েসের ছাপও ধরে গেছে রীতিমত। দুজনের মধ্যে গল্প-গুজবের পাটও চুকে গেছে বহুকাল। বহুক্ষণ একটানা চুপচাপ বসে থাকার পরে কেউ হঠাৎ একটা কথা বলে ফেললে চমকে ওঠে অন্যজন। মাঝেমধ্যে মাকড়শা বলে, 'আমার আর ভাল লাগছে না।' অনুপ সায় দেয়, 'আমারও'।

অনুপ ইদানীং শ্রাবন্তীর সঙ্গে খুব একটা দেখা করে না। শ্রাবন্তীর ফোন এলে 'কাজ আছে' বলে কাটিয়ে দেয় অধিকাংশ সময়। দেখা হলেও বলার মতো কথা বিশেষ খুঁজে পায় না। তবে শ্রাবন্তী বকবক করে যায় একতরফা।

ওর বেশির ভাগ গল্পই ফ্যাশান আর সিনেমা নিয়ে। সেদিন ও হৈ-হৈ করে এসে বলল, 'জানো আমি লিবারেটেড উইমেন্‌'স গ্রুপের মেম্বারশিপ পেয়েছি। ওরা কিন্তু যাকে-তাকে মেম্বার করে না। গ্রুপের প্রেসিডেন্ট মিসেস সাক-সেনা নিজে আমার ইণ্টারভিউ নিয়েছেন। ইণ্টারভিউ দেবার সময় আমার যা বুক কাঁপছিল না···তবে ভদ্রমহিলা অসম্ভব ভাল, আর যা মড্‌ না···।'

শুনে অনুপ কেমন যেন চমকে উঠে বলেছিল, 'অ!'

সেদিনের পর থেকে শ্রাবন্তীর সঙ্গে অনুপ আর দেখা করেনি। ফোন এলেই বলেছে, 'ভীষণ ব্যস্ত আছি।'

মিথ্যে কথাটা বলার দু-চারদিন পরে অনুপ সত্যি-সত্যিই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল সম্পূর্ণ উটকো এক ঝামেলায়। উটকো ঝামেলা অল্প সময়ের মধ্যে ওকে কম সামলাতে হয়নি। সব ঝামেলাই তৈরি করেছে ধান্দাবাজ, অকৃতজ্ঞ লোকগুলো। অকৃতজ্ঞতা দেখলে অনুপ খুব কষ্ট পায়। মাকড়শা আগে ওকে সাহস দিয়ে বলত, 'ভাল কাজ করছ অথচ বিরোধিতা আসবে না' এ কেমন কথা! নিঃস্বার্থভাবে দেশের দশের উন্নতি করলে কিছু লোক তো গায়ে কাদা ছেটাবেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবে, ভাল কাজ করার অপরাধে কত লোককে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। আমাদের দেশ তো সেই গৌরবময় ঐতিহ্য থেকে সরে যেতে পারে না!'

মাঝেমধ্যে অল্পবিস্তর খোঁচা দিয়ে কথা বললেও মাকড়শা ঝামেলা থেকে উদ্ধার পাওয়ার বুদ্ধি বাতলে দেয় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এবারের গণ্ডগোলে মাকড়শা খুব একটা মাথা ঘামাতে চাইল না। আর অবাক কাণ্ড, অনুপ নিজেও কেমন যেন উদাসীন হয়ে গেছে এবার। ওদিকে গোলমাল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে, এক শহর থেকে আর এক শহরে।

মতলববাজ, অকৃতজ্ঞ লোকগুলো বেশ কায়দা করে গোলমালটা পাকিয়েছে এবার। টাকা খাইয়ে নাম-করা কয়েকজন ডাক্তারকে দলে টেনেছে। ডাক্তার-দের রিপোর্ট ফলাও করে ছাপছে কয়েকটা খবরের কাগজ। কয়েকজন সেয়ানা রাজনৈতিক নেতা তদন্ত কমিটি বসাবার ধুয়ো তুলে নিজেদের দলের প্রচারে নেমে পড়েছে এই সুযোগে। এই পর্যন্ত ব্যাপারটা আওতার মধ্যে ছিল, কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মে হাত পড়েছে—আওয়াজ উঠতেই গোলমালটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। অনুপ পরিষ্কার বুঝতে পারল মতলববাজ লোকগুলো ভেবেচিন্তে কয়েকটা পর্যায়ে গোলমালটা ছড়িয়েছে। কিন্তু এত বুদ্ধি ওরা পেল কোত্থেকে? অনুপ আন্দাজ করল, এর পেছনে নিশ্চয়ই বিদেশী হাত আছে।

বিদেশী হাতের কথা জানতে পারলে আগে প্রশাসনে যেমন একটা আতঙ্ক

ছড়িয়ে পড়ত, এখন আর তেমন হয় না। বিদেশীর চক্রান্ত গুঁড়িয়ে দেবার, ওদের কুবুদ্ধি ভোঁতা করার অনেক লোক আছে এখন এদেশে। অনুপ নিজে চেষ্টা করলে তো কথাই নেই, কিন্তু ও এবার একটুও উৎসাহ পাচ্ছিল না।

চর্বির কাপড়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার জন্যে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে সারা দেশে। সেই প্রচারপত্রের একটা এখন অনুপের টেবিলে। অনুপ প্রচারপত্রের ওপর চোখ রাখল উদাসীন ভঙ্গিতে।

হলুদ কাগজের মাথার দিকে লাল কালিতে বড়-বড় করে লেখা : ক্ষতি-কারক চর্বির কাপড় বয়কট করুন।

বয়কট করার কারণগুলো এক, দুই করে লেখা। মোদ্দা কথা হল : মানুষের শরীরের পক্ষে চর্বি অত্যন্ত দরকারি। চর্বি শরীরের উত্তাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে। মানুষের পায়ের তলায় চর্বি আছে বলেই মানুষ হাঁটতে পারে, নাহলে পারত না। নিতম্বে চর্বি না থাকলে শক্ত জায়গায় কেউ বসতে পারত না। এখানে ব্রাকেটের মধ্যে আছে, মেয়েদের 'গুরু নিতম্ব' না থাকলে কবি কল্পনার বিস্তারও বাধাপ্রাপ্ত হয়। দেহের মাংস-পেশীতে হাড়ের জয়েন্টে চর্বি না থাকলে শরীর-যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। খাদ্যের অনটন হলে কিংবা কেউ যদি ইচ্ছে করে উপোস করে, দেহের সঞ্চিত চর্বি দগ্ধ হয়ে শরীরকে বাঁচায়। নারীদেহে প্রাকৃতিক নিয়মে বেশি চর্বি আছে। ওই চর্বি গর্ভের সন্তানের দেহগঠনে অত্যাবশ্যক। প্রসূতির শরীরে প্রয়োজনীয় চর্বি না থাকলে সন্তানের শরীর ভালভাবে গড়ে ওঠে না, বাচ্চার রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায় এবং তার চিররুগ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব মানুষের চর্বি থেকে কাপড় বোনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

এই প্রচারকে থামিয়ে দেবার জন্যে পালটা প্রচার-অভিযানে নামল অনুপের কোম্পানি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তারদের সইসমেত পুস্তিকা বিলি করা হল হেলিকপ্টার থেকে।

পুস্তিকার ওপরে বড়-বড় হরফে লেখা : অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। দেহের অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় সম্পদ. জাতীয় সম্পদের সার্থক ব্যবহার করে অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখুন।

পুস্তিকায় ষোলোটি ভাষায় চর্বির কাপড়ের যে গুণগান করা হয়েছে তার সারমর্ম হল এই : দেহে বাড়তি চর্বি থাকলে শরীরে নানা ত্রুটি দেখা দেয়। অতিরিক্ত চর্বি হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে সঠিকভাবে কাজ করতে দেয় না। মেদবহুল শরীর হৃদরোগ, রক্তচাপবৃদ্ধিরোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয় সহজেই। বেশি মোটা মানুষরা স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না, দেহের রক্তধারা সহজভাবে প্রবাহিত হওয়ার পথে বাধা পায়। মোটা লোক কাজের অযোগ্য,

তাদের শরীর ভেঙে পড়ে তাড়াতাড়ি, ফলে তারা স্বল্পায়ু হয়। বাড়তি চর্বির চাপে পিটুইটারি, থাইরয়েড ইত্যাদি গ্ল্যান্ড দুর্বল হয়ে শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে একটি কথা আছে—এভরি পাউন্ড অব একসেস ফ্যাট মে মীন এ মান্থ লেস অব লাইফ। অত্যন্ত খাঁটি কথা। এক পাউন্ড ওজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মাস আয়ু কমে যায়। ওজন বাড়ার অর্থই চর্বি বাড়া। ওই চর্বি কাপড় তৈরি প্রকল্পে বিনিয়োগ করে অর্থোপার্জন করুন এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান। এখন আর ওজন কমাবার জন্যে উপবাস করার প্রয়োজন নেই। যা ইচ্ছে, যত ইচ্ছে খেয়েও রোগা থাকা সম্ভব। এই পুস্তিকা-তেও ব্রাকেটের মধ্যে একটি কথা আছে। তা হল, 'গুরু নিতম্ব' দেখতে না পেলেও কবি-কল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হবে না, কারণ এখন চতুর্দিকেই সুন্দরীদের ক্ষীণ কটি। ওই ক্ষীণকটিতে স্তনচূড়ার ছায়া দেখে কবি-কল্পনা আদিগন্ত বিস্তৃত করে।

প্রচারের জবাবে পালটা জবাব, আর জবাবটিও মোক্ষম। ওই জবাব দেখে দেশবাসী যখন চর্বির কাপড়ের পক্ষে চলে আসছিল তখন বিরোধী পক্ষ সনাতন হিন্দুধর্ম গোল্লায় যাবার ধুয়ো তুলল। ব্যস, হাওয়া ঘুরে গেল আবার। মানুষের শরীরে চর্বি থেকে কাপড় বোনা শাস্ত্রবিরোধী ব্যাপার। ওই কাপড় পরে ঈশ্বরের আরাধনা করা অনুচিত। কোন্ এক সাধু স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন, মানুষের শরীরের চর্বি থেকে কাপড় বোনা অশাস্ত্রীয় কাজ। এই প্রথা বিলোপ করার জন্য পুণ্যাত্মাদের ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত! স্বপ্নাদেশের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার পরে কয়েকজন পুণ্যাত্মা অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন।

অনুপের কোম্পানি এবং সরকারি প্রশাসন-যন্ত্র শক্ত হাতে অভূতপূর্ব এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় নেমেছে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে দেশের কোথাও-কোথাও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। একটি শহর তো কারফিউয়ের আওতায়।

এত বড় একটা কাণ্ড, অথচ সেই অবসাদ আর ক্লান্তির হাত থেকে অনুপ এখনো মুক্তি পায়নি। কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়াই ওর মধ্যে ফুটে উঠছে না। মাকড়শাও আজকাল কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। পরামর্শ দেওয়া তো দূরের কথা, ঘটনাগুলো জানার ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় না।

সেদিন অনুপ হঠাৎ লক্ষ্য করল, মাকড়শার গায়ের রঙ বেশ কালো হয়ে গেছে। আটটা পা বোধহয় আর আগের মতো কর্মক্ষম নয়। সোফার হাতলে বসে টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ বন্ধ করল মাকড়শা। বন্ধ করেছে তো করেই আছে।

আজকাল কারও সঙ্গে কথা বলতে অনুপের আর তেমন ভাল লাগে না। কোলের মধ্যে হাতদুটো জড় করে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে ও কোনো

রকমে বলল, 'ঘুম পাচ্ছে ?'

'না।' কয়েক মুহূর্ত পরে উত্তর দিল মাকড়শা।

'তাহলে চোখ বুজে বসে আছেন কেন ?'

মাকড়শা ম্লান হেসে বলল, 'চোখ খোলা রেখেই বা কী করব ?'

বহুদিন পরে সামান্য চমকে উঠল অনুপ। 'কেন, কী হয়েছে আপনার ?'

ঠিক আগের মতো গলায় মাকড়শা উত্তর দিল। 'আজকাল চোখে আর ভাল দেখতে পাই না।'

'সে কি ! আপনি কখনো বলেননি তো ! এক্ষুনি আপনার চোখ দেখানো দরকার। ডাক্তারকে একটা কল্ দিই।'

'ন্না, ডাক্তার ডাকার দরকার নেই।' সামান্য নড়েচড়ে স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল মাকড়শা।

অনুপ ভাল করে জানে মাকড়শার 'না' মানে 'না'-ই। একবার 'না' করলে ওকে 'হ্যাঁ' বলাবার সাধ্য নেই কারও।

কিন্তু মাকড়শার জন্যে কিছু একটা করা দরকার যাতে ও কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ভাল বোধ করে। অনুপ বিনীতভাবে বলল, 'চলুন না দু-চারদিনের জন্যে কোনো জায়গায় থেকে বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় ?' ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল মাকড়শা।

'কোনো পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রের ধারে।

শুনে মাকড়শা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। অনুপ ওর গম্ভীর হওয়ার কারণটা আন্দাজ করে বলল, 'তার চেয়ে চলুন কোনো জঙ্গল থেকে ঘুরে আসি।'

কথাটা কানে যেতেই মাকড়শা কেমন যেন কেঁপে উঠল। তারপর চোখ বড়-বড় করে অনুপের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে বলল, 'জঙ্গল কি তোমার আর ভাল লাগবে ?'

বহুদিন পরে অনুপের শরীরেও বিচিত্র এক উত্তেজনা খেলে গেল। ও বেশ জোর দিয়ে বলল, 'খুব ভাল লাগবে। তাহলে যাবার ব্যবস্থা করি।

মাকড়শার আটটা পা নড়ে উঠল। 'কাউকে জানাবার দরকার নেই, চলো আমরা পালিয়ে যাই।'

তাই ঠিক হল।

পরদিন ভোরে কাক ডাকার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল মাকড়শা আর অনুপ। একটা ট্যাক্সিতে চেপে সোজা স্টেশনে। টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে দুজনে বেশ আয়েশ করে বসল। অনেক দিন পরে দুজনেই বেশ উত্তেজিত বোধ করছিল। ট্রেন ছাড়ার পরে সেই আগের মতো মন খুলে গল্প জুড়ে দিল মাকড়শা আর অনুপ।

লম্বা কয়েক দফা গল্পের শেষে সন্ধে এসে গেল। সন্ধের পরে রাত্তির,

ঘুমে-গল্পে কেটে গেল রাত্তিরটাও।

পরদিন বিকেলে ওরা পেঁছে গেল সেই তিতোরিয়ায়। মধ্যিখানে সুদীর্ঘ সময় কেটে গেছে, ভারতবর্ষের চেহারা পালটে গেছে আকাশ-পাতাল, অথচ তিতোরিয়ার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। অনুপের সেই সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। তখন ও চাকরি করত, কোম্পানির কারখানার জন্যে সাইট দেখতে এসেছিল এখানে। ওই তো ওখানে ঝাপসা হরফে লেখা তিতো-রিয়া নামের ফলকটা। ছবির মতো সেই জীবনের সবকিছু ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। আর ভেসে উঠতেই এক ধরনের বেদনাবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। মনে হল, সেই জীবনটা কত ভাল ছিল!

ওর কাঁধের ওপর ছটফট করছিল মাকড়শা। তাড়া লাগাল, কেই, জঙ্গলে চলো।'

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে জঙ্গলের পথ ধরল অনুপ। জঙ্গলটাও ঠিক সেইরকম আছে। চারদিকে ঠাসা গাছপালা, পায়ের নীচে লম্বা-লম্বা ঘাস। কোথাও-কোথাও জঙ্গল এত ঘন যে মাথার ওপরের টুকরো আকাশটাও হারিয়ে যাচ্ছিল।

গাছের ডালে কাঠবেড়ালি, গাছের নিচে বেজি দেখে ঠিক সেদিনের মতো সাপের কথা মনে পড়ে গেল অনুপের, কিন্তু সেদিনের সেই ভয়টা এখন কয়েক হাজার মাইল দূরে। কাঁধের ওপর উদাস হয়ে বসে আছে মাকড়শা। কখনো চোখ বড়-বড় করে চারদিকে তাকাচ্ছে, কখনো চোখ বুজে বসে আছে চুপ করে।

এমন সময় জঙ্গলের মধ্যে সন্ধের অন্ধকার নেমে এল ঝুপ করে। আকাশের একটা দিক টুকটুকে লাল। ওই আলোয় মেঘের টুকরোগুলো বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। মৃদু হাওয়ায় গাছের পাতায় খসখস, গাছের ওপরে পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

অনুপ টের পাচ্ছিল মাকড়শার পা-গুলো অসম্ভব গরম হয়ে উঠেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী, কী হয়েছে আপনার? গা এত গরম কেন?'

মাকড়শা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে ভারী, কান্নাজড়ানো গলায় নিজেদের ভাষায় কী সব যেন বলে গেল।

কথাগুলো এত জড়ানো যে কিছুই বুঝতে পারল না অনুপ, কিন্তু ও একটা প্রশ্নও করল না।

আকাশের গাঢ় লাল রং ঝাপসা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। টুকরো মেঘের সেই বাহার আর নেই। চাপ-চাপ অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত। জঙ্গলের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে, সেই গন্ধ এখন সর্বত্র।

হঠাৎ অনুপের কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের গাছের ডালে লাফিয়ে

পড়ল মাকড়শা। তার পর খুব দ্রুত করেকটা চক্কর মেরে সেই সেদিনের মতো একটা জাল বুনে ফেলল। জালের মধ্যিখানে আটটা পা ছড়িয়ে বসল মাকড়শা। সন্ধের ঝাপসা আলোয় মাকড়শাকে অসম্ভব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, ঠিক সেই সেদিনের মতো।

মাকড়শাকে খুশি হতে দেখে অনুপের বুকের মস্ত একটা ভার নেমে গেল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ও টের পেল ওর শরীরের কোথাও আর সেই অবসাদ, ক্লান্তি নেই। শরীর মন বেশ ঝরঝরে আর তাজা লাগছিল অনুপের।

মাকড়শা কোনো কথা না বললেও ওর দিকে তাকিয়ে অনুপ পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, মাকড়শা কখনোই আর তিতোরিয়ার এই জঙ্গল ছেড়ে শহরে ফিরবে না। কিন্তু অনুপ কী করবে এখন ?

অনুপের কেমন যেন এক বিভ্রম তৈরী হয়েছিল। কোনটা সত্যি ? এই জঙ্গল, না জঙ্গলের বাইরের ধনী দেশ ?

কিছু-কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো খুব সহজেই উঠে আসে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সে-সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। অনুপ ওর প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল নিঃশব্দে। অনুপের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক অনুপের মতনই কয়েকটা গাছ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাকড়শা ভরাট গলায় বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে। এই জঙ্গলে এত রাত তোমার পক্ষে…।'

অনুপ বুঝতে পারল মাকড়শা কী বলতে চাইছে। আর বোঝার পরেই ছেলেমানুষী এক অভিমান ওর বুকে আর গলায় ছড়িয়ে পড়ল। নিজেকে সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও ওর গলা কেঁপে গেল। কোনোমতে বলল, 'চলে যেতে বলছেন তো, কিন্তু আমি যদি না যাই !'

শুধু শব্দে নয় কন্ঠস্বরেও কিছু কথা থাকে। আড়ালের সেই কথাগুলো ধরে ফেলে মাকড়শাও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে স্নেহের গলায় বলল, 'আমরা তো জঙ্গলেরই বাসিন্দা, কিন্তু তুমি কোন্ দুঃখে জঙ্গলে থাকবে ?'

'দুঃখে থাকব, কোন্ দুঃখে ? বিশ্বাস করুন, এই জঙ্গলে এসে আমার সব দুঃখ চলে গেছে। অনেকদিন পরে মনটা বেশ হাল্কা লাগছে।'

অনুপের কথায় বেশ খুশি হয়ে মাকড়শা ওর জালে গোটাকয়েক চক্কর মেরে বলল, 'তুমি এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন, দুনিয়াজোড়া তোমার ব্যবসা। সবকিছু ছেড়েছুড়ে এই জঙ্গলে থাকা কি তোমাকে মানায় ?'

একটু ঘুরিয়ে জবাব দিল অনুপ। 'আপনি বোধহয় চান না আমি এখানে থাকি।'

মাকড়শা আহত হয়ে বলল, 'ন্না, সে কথা আমি বলছি না। তবে সারা

দেশে এখন প্রচন্ড গোলমাল চলছে, এই অবস্থায় তোমার এখানে থাকা কি ঠিক হবে?'

'গোলমাল থামাবার লোকও আছে দেশে।'

'তারা কি পারবে?'

প্রশ্নের উত্তরে গলা ছেড়ে হেসে উঠল অনুপ! এমন হাসি ও বহুদিন হাসেনি। হাসি থামলে ও বলল, 'গোলমাল না থামলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ভালই তো, আমরা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসব। যেখানে ছিলাম সেখান থেকে যাহোক কিছু শুরু করা যাবে আবার।'

নিজের জালে গোটাকয়েক চক্কর মেরে মাকড়শা হাসতে হাসতে বলল, 'মন্দ বলোনি।'

একটু পরে সমস্ত অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মস্ত চাঁদ উঠল আকাশে। চাঁদের আলোয় বইতে লাগল ফুরফুরে বাতাস। আর সেই বাতাসে বুনো ফুল আর চারদিকের গাছগাছালির গন্ধ হঠাৎই ভীষণ তীব্র ও আচ্ছন্নকর হয়ে উঠল।

মধ্যিখানে বেপাড়া

বিভাস বলল, "আরে এ-পাড়ায় এসব আছে জানতাম না তো !"

"কী সব ?" প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে পারমিতা রিকশা থেকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে চারদিকে তাকাল, কিন্তু অবাক হবার মতো কিছুই দেখতে পেল না।

সামনের রাস্তায় কোনোমতে এদিক-ওদিক করতে করতে একটা লরি মুখ ঘোরাচ্ছিল বলে ওদের রিকশাটা থেমে গিয়েছিল একপাশে।

পারমিতা কিন্তু থামল না। বিভাসের আচমকা কথার মধ্যে এমনই একটা বিস্ময় ছিল যে পারমিতা অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বলছ ? কাদের কথা বলছ ? আরে—!"

লরির মুখ প্রায় ঘুরে এসেছে, আর একটু ঘুরলেই রাস্তার ধার দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে রিকশাটা। সামনে চোখ রেখে বিভাস চাপা গলায় বলল, "ডানদিকে তাকাও।"

ডানদিকে তাকাবার পরেও কিছুই পরিষ্কার হল না পারমিতার কাছে। "কী ?"

বিভাস ঠিক আগের মতোই চাপা গলায় বলল, "খোলার ঘরগুলোর সামনে কয়েকটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ। কেন ?"

"কেন আবার, খদ্দের ধরার জন্যে। প্রস্টিটিউট।"

পারমিতা এতই মন দিয়ে মেয়েগুলোকে দেখছিল যে বিভাসের শেষ কথার পুরোটা ওর কানে গেল না : "কী ?"

সামনের লরিটা মুখ ঘুরিয়ে হুড়মুড় করে চলে যাবার পরে রিকশা ওই রাস্তায় ঢুকল। বিভাস এবার পারমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে বাবা, মেয়েগুলো বেশ্যা।" বলতেই পারমিতা মুখ ঘুরিয়ে আবার দেখতে শুরু করে দিল মেয়েগুলোকে। বিভাস কনুইয়ের খোঁচা মারল। "ওভাবে তাকিও না।" কিন্তু ওর বলায় কোনো কাজ হল না, রিকশা একটু এগিয়ে বাঁক নেবার পরে মুখ ফেরাল পারমিতা। তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সত্যিই ওরা···।"

"এর মধ্যে আবার সত্যি-মিথ্যে কী আছে ! তবে বাড়ি ভাড়া নেবার আগে জানতাম না যে এত কাছে···।"

"আগে দেখতে পাওনি ওদের ?"

"কী করে দেখব ? বাড়ি দেখতে এসেছিলাম দিনের বেলায়। দিনের বেলায় তো ওরা আর রাস্তায় দাঁড়ায় না।"

"কেন ?"

বিভাস এবার হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'কেন আবার, সারা রাত্তির জাগলে দিনের বেলায় ঘুম পায় না ? ওরা দিনের বেলাটা পড়ে পড়ে ঘুমোয়, রাত্তিরে জাগে।"

"সা— রা রাত ?"

প্রশ্নের সামনেই ওদের বাড়ি এসে গেল। নতুন বাড়ির একতলার এই ফ্লাটটায় সবে দিন-তিনেক হল ওরা এসেছে। বেশ পছন্দসই ফ্লাট। ঘরদুটো আর একটু বড় হলে আরো ভাল হত, কিন্তু সব তো আর মনের মতো হয় না। ঘরের এই মাপটা ছাড়া বাকি সব ওদের দিব্যি মনে ধরে গেছে। কীভাবে ফ্লাট সাজাবে তাই নিয়ে পারমিতার হাজাররকম পরিকল্পনা। আজ সারাদিন ঘর-সাজানো নিয়ে ও কম বকবক করেনি, কিন্তু এখন, এই সন্ধেবেলায় প্রসঙ্গ পালটে গিয়েছিল একেবারে।

পাড়াটা বেশ নিরিবিলি। এত নিরিবিলি অবশ্য শেষ পর্যন্ত থাকবে না। আশেপাশে অনেকগুলো অর্ধেক-বানানো বাড়ি, বাড়িগুলো শেষ হলে, লোকজন এলে ভিড় কিছুটা বাড়বে। তবে সে-ভিড় নিশ্চয়ই আগের পাড়ার মতো হবে না। গ্রিল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট বারান্দায় বসে এইসব নিয়ে কাল আর পরশু পারমিতা অনেক কথা বলেছিল। আজ ঠিক সেখানে বসেই চা খেতে খেতে বিভাস পুরনো প্রসঙ্গটা উসকে দিল, কিন্তু আগের মতো খেই ধরলো না পারমিতা। উলটে দুম করে প্রশ্ন করে বসল, "আচ্ছা, এইভাবে রাতের পরে রাত মেয়েগুলো—ওদের কষ্ট হয় না ?"

প্রশ্নটার মানে বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে গেল বিভাসের, তারপর ও গলা ছেড়ে হেসে উঠে বলল, "তুমি এখনও এইসব নিয়ে ভাবছ।"

ঠাট্টার হাসিতেও পারমিতার চোখ-মুখের চেহারা পালটাল না।

চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল বিভাস। দূরের রাস্তার লাইটপোস্টের আলো কিছুটা ভেসে এসেছে এই বারান্দায়। গ্রিলের নকশার ছাপ সেই আলোয়। চারদিক চুপচাপ। এই পরিবেশে একজন আগ্রহী শিক্ষার্থী পেলে শৌখিন মাস্টারমশাইরা যা করে বিভাসও তাই করল। একটু কেশে নিয়ে ভারিক্কি চালে বলল, "ওদের কষ্টের কথা জিজ্ঞেস করছ ? কষ্ট তো সামান্য ব্যাপার, গোটা জীবনটাই ওদের অভিশপ্ত।"

বক্তৃতার শুরুটা বিভাসের নিজের কাছেই বেশ ভাল লেগে গেল। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে গলা সামান্য খাদে নামিয়ে বলল, "সারা রাত্তির জেগে

ওরা যা রোজগার করে তার পনেরো আনাই কিন্তু চলে যায় বাড়িউলি, দালাল আর গুন্ডার পেটে। তারপর দুদিন বাদেই মেয়েগুলোর বিশ্রী সব অসুখ ধরে। ওই অসুখেই ভুগতে ভুগতে মরে সব ক'টা। অথচ—।"

থামিয়ে দিয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থিনী বেমক্কা প্রশ্ন করে বসল, "তুমি এসব জানলে কোত্থেকে ?"

এই ধরনের প্রশ্নে যে-কোন শৌখিন মাস্টারমশাই চটে যায়, বিভাসও চটে গেল। কিন্তু রাগ না দেখিয়ে ও হাসল, হাসতে হাসতে ভাবল, তারপর বলল, "কিছুদিন আগে রেডলাইট-এরিয়ার একটা সোশিও-ইকনোমিক সার্ভে রিপোর্ট পড়েছিলাম, তার থেকেই বলছি। এগুলো গাঁজাখুরি কথা নয়।"

পারমিতার এবার একেবারে ঘায়েল হয়ে যাওয়ার কথা। হচ্ছিলও, কিন্তু তার আগে কী যেন মনে পড়ে যেতেই সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলল, "ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"

"কী মনে পড়েছে ?"

"গতবারের আগেরবারের পুজোর উপন্যাসে এই ধরনের একটা মেয়ের কথা ছিল। ইশ্ কী কষ্ট মেয়েটার! শেষে আত্মহত্যা করেছিল। কী যেন নাম মেয়েটার—!"

বিভাস অসন্তুষ্ট হয়ে হাতের আধখানা সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে উঠে পড়ল। খাবার টেবিলে প্রসঙ্গটা আবার তুলল পারমিতা। ওর প্রশ্নের শেষ নেই, বিস্ময়ের শেষ নেই, কল্পনার শেষ নেই কিন্তু আলোচনায় একটুও উৎসাহ পাচ্ছিল না বিভাস। ওর জমাটি বক্তৃতা মার খাওয়ার দুঃখ ভুলতে পারছিল না কিছুতেই।

পরদিন হাফ-ডে অফিস ছিল বিভাসের। বিকেলে ওরা সিনেমা দেখতে গেল। রুপালি পর্দায় কিশোর-কিশোরীর প্রেম, মজা, তারপর ভয়ংকর সব ষড়যন্ত্র, বিরহ, কান্নাকাটি, শেষে মিলন। এ সব দেখলে মন ভরে যায়। সিনেমার শেষে আরো কিছুক্ষণ সিনেমার গল্প করতে করতে ভরাট হয়ে থাকে পারমিতা। কিন্তু আজ হল্ থেকে বেরিয়েই ও বলল, "কাল একদম ধারের দিকে যে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল না, নায়িকাকে অনেকটা তার মতো দেখতে। না ?"

প্রশ্নের জটে বিভাস প্রথমে জড়িয়ে গিয়েছিল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "যা-বাবা !"

ওদের পাড়া বাসে মাত্র ছটা স্টপ এখান থেকে। ফাঁকা রাস্তায় বাস ছুটল হু-হু করে। বাস থেকে নেমে রিকশায় উঠল ওরা। পারমিতা কেমন যেন টানটান হয়ে বসেছিল। একটু পরেই এসে গেল সেই খোলার ঘরগুলো। পারমিতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রায় ছেলেমানুষের ঢঙে হাত তুলে বলল, "ওই

যে ওই মেয়েটা, সালোয়ার-কামিজ পরা, দেখতে পাচ্ছ ?"

বিভাস চাপা গলায় ধমক লাগিয়ে পারমিতার হাতটা নামিয়ে দিয়ে বলল, "কী হচ্ছে কী !"

পারমিতা ধমকটা গ্রাহ্যই করল না। রিকশা রাস্তার বাঁক পেরুবার আগে পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল মেয়েগুলোকে, তারপর ঠিক কালকের মতো লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সিনেমার নায়িকার সঙ্গে বেশ মিল আছে না মেয়েটার ?"

"আচ্ছা, তুমি ওদের দিকে অত ঘুরে ঘুরে তাকাও কেন বলো তো ?"

"কেন, কী হয়েছে তাতে ?"

"ন্না, ওভাবে তাকিও না।"

বাড়ি ফেরার একটু পরে ওরা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে গ্রিল-ঘেরা বারান্দায় এসে বসল। ঝিরঝিরে বাতাস আসছিল রাস্তা থেকে। চারদিকই নির্জন। আধখানা-বানানো বাড়িগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ওদিকে। গ্রিলের বাহারি ছায়াগুলো দুলছিল সমানে।

আগের পাড়াটা ছিল অন্যরকম, সারা দিনই ধরতে গেলে শুধু চিৎকার আর চেঁচামেচি। এখানে কী সুন্দর নির্জনতা। হঠাৎ-হঠাৎ বিভাসের মনে হচ্ছিল, কোথাও যেন বেড়াতে এসেছে। নতুন বাড়ির নতুন চুন-সিমেণ্টের গন্ধ বোধহয় কল্পনাশক্তি বাড়িয়ে দেয়। বিভাস এখন রঙিন সিনেমায় দেখা কুলু ভ্যালিতে। আহ্ ! ভ্যালিটা কী সবুজ ! বাংলোর চালটা টুকটুকে লাল, পিলারগুলো জড়িয়ে উঠেছে গাঢ় সবুজ লতানো গাছ। চোখ ফেরানো যায় না ওখান থেকে। এসব জায়গায় গেলে শুধু কিশোর-কিশোরীরা কেন, বুড়ো-বুড়িরাও বোধহয় নতুন করে প্রেমে পড়ে যাবে।

ওদিকে আবার ওই মুহূর্তে পারমিতার কল্পনাতেও একটা বুড়ো এসে গেছে। আসতেই ও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোণের দিকে একটা মোটামতো মেয়ের সঙ্গে একটা বুড়ো কথা বলছিল, ও কেন গিয়েছিল ওখানে ?"

বিভাস হেসে ফেলে বলল, "কেন আবার, যে-জন্যে সবাই যায় সেই জন্যে।"

"যাহ্ ! অত বুড়ো !"

পারমিতার কথা শুনে কালকের সেই বক্তৃতা দেবার মেজাজটা ফিরে এল বিভাসের। ও লম্বা লেকচার দেবার জমি তৈরি করল প্রথমে, "সেক্স এমনই একটা জিনিস—বুড়ো, বাচ্চা কাউকেই মানে না।"

"তা বলে অত বুড়ো !"

উত্তরে বিভাস বিচিত্র এক রহস্যের হাসি হাসল। মোনালিসা আর মাকিয়াভেলির হাসি মিশিয়ে দিলে এই ধরনের একটা হাসি হতে পারে। কিন্তু

বারান্দায় ঝাপসা আলো থাকার জন্যেই বোধহয় ওই হাসি দেখে পারমিতা খুব একটা বিহ্বল হল না।

বিভাস একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিঠা খুব আলতো করে দুলিয়ে-দুলিয়ে নেবাল, তারপর গালভর্তি ধোঁয়া ঠোঁট সরু করে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "বুড়োটা হয়তো একটা সেক্স-ম্যানিয়াক, কিংবা হয়তো স্টিমুলান্ট যোগাড় করার জন্যে ওখানে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরে বউকে খুব ভালবাসবে।"

বিভাসের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে না পেরে পারমিতা চোখ গোলগোল করে তাকাল।

বিভাস এটাই চেয়েছিল। শ্রোতা ঘাবড়ে গেলে বোধহয় বক্তার মেজাজ আসে, উৎসাহিত হয়ে বিভাস বলল, "তোমাকে একটা গল্প বলি শোনো।" তারপরেই নিজেকে সংশোধন করে নিল—'গল্প নয় রিপোর্ট'। একজন নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট লিখেছে, বিলিতি একটা কাগজে পড়েছি।"

একটু থেমে রিপোর্টের মধ্যে ঢুকল বিভাস। উৎসাহিত হয়ে ও বলল, "একজন বুড়ো অধ্যাপক সেক্স স্টিমুলাণ্ট নেবার জন্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে পর্নোগ্রাফি পড়ত। কাজও হত তাতে। দিব্যি সুখে কাটছিল অধ্যাপকের দাম্পত্যজীবন। কিন্তু আস্তে আস্তে ভদ্রলোকের মধ্যে একটা অপরাধবোধ তৈরি হল। এত বড় স্কলার, সবাই মান্যগণ্য করে, সে কি না সেক্স-স্টিমুলাণ্ট নেবার জন্যে পর্নোগ্রাফি পড়ে। এই অপরাধ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ল ভদ্রলোক, তারপর গেল এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। সাইকিয়াট্রিস্ট খুব মন দিয়ে কেস-হিস্ট্রি নেবার পরে বলল—আপনি কিছু অন্যায় করেননি, আপনার ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত সুস্থ এবং স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এই ব্যাপারে স্ত্রীর কাছে কিছুই লুকোবেন না। বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করুন। আপনার স্ত্রীর যদি আপত্তি না থাকে আপনারা একসঙ্গেও পর্নোগ্রাফি পড়তে পারেন। আমার মনে হয় তাতে রেজাল্ট আরো ভাল হবে। প্রয়োজন হলে বাইরে থেকে সেক্স-স্টিমুলান্ট যোগাড় করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। এই রিপোর্টের শেষে একটা নোট ছিল। সেটা হল, সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শে অধ্যাপকের দাম্পত্যজীবন নাকি আরো সুখের হয়ে উঠেছিল।"

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বিভাস বলল, "এমনও হতে পারে খোলার ঘরের সামনের ওই বুড়োটা লোক হিসেবে খুব ভাল, পারিবারিক জীবনে বেশ দায়িত্বশীল, কিন্তু স্রেফ একটা স্টিমুলাণ্ট নেবার জন্যে—।"

কথাটা শেষ করতে দিল না পারমিতা, কেমন যেন ক্ষেপে উঠে বলল, "বেশি বড়-বড় কথা বোলো না তো। এক নম্বরের পাজি বুড়ো, মার খেলেই এদের অসুখ ভাল হয়ে যাবে।"

মনস্তত্ত্বের জটিল ব্যাপারগুলো ধরবার একটুও চেষ্টা না করার জন্যে

পারমিতার ওপর সামান্য অসন্তুষ্ট হল বিভাস। কিন্তু রাগ না দেখিয়ে বলল, "তোমাকে আর একটা উদাহরণ দিই, একটা মেয়ে, ওই কাগজটাতেই আছে—।"

বিশ্রীভাবে থামিয়ে দিয়ে পারমিতা বলল, "রাখো তো তোমার বিলিতি কাগজ, বিলেত আর আমাদের দেশের সমস্যা এক ধরনের নয়।"

এ-কথার পরে নিজেকে আর সামলানো যায় না। বিভাস গলা তুলে বলল, "কী পাগলের মতো বকছ। ওদের দেশের মানুষের কি তিনটে হাত না চারটে পা? খিদে, ঘুম, ওইসব—সব দেশের সব মানুষেরই সমান। তবে, তুমি যদি বলো অ্যাফ্লুয়েণ্ট সোসায়েটির—।"

পারমিতা কিছুই বলল না, শুনলও না। হঠাৎ উঠে পড়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

বিভাস বিরক্ত হয়ে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল, তারপর আরো বিরক্ত হয়ে আর একটা সিগারেট ধরাল, তারও পরে সামনের ওই আধখানা বানানো বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকল মুখ ভারী করে।

খাবার টেবিলে খুব একটা কথা হল না। রেডিওতে অনুরোধের রবীন্দ্র-সঙ্গীত হচ্ছিল, খেতে খেতে সেই গানগুলো শুনল ওরা। মাঝে অবশ্য পারমিতা চাল-ডাল-মার্কা কিছু কথা তুলেছিল, কিন্তু সে-সব কথায় একেবারেই কান দিল না বিভাস।

শোবার পরে দু-চারটে এ-কথা সে-কথা বলার পরে পারমিতা বলল, "এখন আমরা আরাম করে ঘুমোচ্ছি আর ওই বেচারারা…।"

"বেচারা নয়, ওরাও আরাম করছে।"

পারমিতা একটু আহত হয়ে বলল, "তবে তুমি যে বললে ওদের খুব কষ্টের জীবন।"

"আরে কষ্ট মানে কি সবসময় কষ্ট। কষ্টের সময় কষ্ট, ফুর্তির সময় ফুর্তি।"

এ-কথার কোনো উত্তর দিল না পারমিতা। ঘর অন্ধকার, কিন্তু বিভাস পরিষ্কার বুঝতে পারল, পারমিতার চোখেমুখে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। প্রশ্নগুলো আন্দাজ করে বিভাস বলল, "খদ্দের বুঝে ওদের সময় কাটে। খদ্দের ভাল হলে ভাল সময়, খারাপ হলে খারাপ।"

সঙ্গে সঙ্গে ধরতাই পেয়ে গেল পারমিতা, খুশি-খুশি গলায় বলল, "ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। কার যেন গল্পে ঠিক এই ধরনের একটা ঘটনা ছিল। ভদ্রঘরের একটা ছেলের সঙ্গে এই ধরনের একটা মেয়ের খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা বিয়েও করে ফেলেছিল মেয়েটাকে। তারপর সে কি ঝঞ্ঝাট! আচ্ছা, লেখকরা এতসব জানে কী করে?"

"যায় তাই জানে।"

"যাহ্!"

"যাহ্ কী ? না গেলে তোমাদের জানাবে কী করে ?"

"তাই বলে সব লেখক ?"

"সবাই হয়ত যায় না, তবে না গেলেও ওদের অসুবিধে হয় না।"

"কেন ?"

পারমিতার প্রশ্নের মাঝখানে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ আর ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছিল অন্ধকার ঘরের মধ্যে। বিভাস একটা হাই তুলে বলল, "প্রত্যেক লেখকের একটা করে এক্স-রে আই থাকে। ধরো এইসব পাড়ার এক মাইল দূর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক দেখতে পেয়ে গেল ঘরের মধ্যে কী হচ্ছে।"

মাঝরাত্তিরে একজন সরল মানুষ বোধহয় আরো সরল হয় যায়, পারমিতা অবাক বিস্ময়ে বলল, "আমি না কখনো লেখক দেখিনি, দেখাবে ?"

ঘুমজড়ানো গলায় বিভাস বলল, "উম্ দেখাব, ছুটির দিনে।"

॥ ২ ॥

কলকাতায় এক পশলা বৃষ্টি হলে আর সেইসঙ্গে দুটো মিছিল বেরুলে সারা শহরের চেহারা খবরের কাগজে ছাপানো 'খরাক্লিষ্ট মাঠের' ফোটোগ্রাফের মতো হয়ে যায়। ফেটে চৌচির-হয়ে-যাওয়া মাঠের টুকরোগুলোর মধ্যে মানুষগুলো আটকে যায় পিঁপড়ের মতো। বাড়ি ফেরা, কোথাও যাওয়া শিকেয় ওঠে তখন।

বিভাসের বাড়ি শহরের যে প্রান্তে, ঠিক তার উলটো প্রান্তে এক সহকর্মীর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে আটকে গিয়েছিল ও। বৃষ্টি, জল, কাদা আর ভিড়ে সারা শহর থমথমে হয়ে আছে। অনেকে পরামর্শ দিল, আজ আর যেতে পারবেন না, থেকে যান, কাল ফিরবেন। কিন্তু বিভাস রাজি হল না। পারমিতা বাড়িতে একা, পাড়াটাও নতুন, তার ওপর অসম্ভব ভীতু মেয়ে।

এ-গাড়ি সে-গাড়ি করে আর হেঁটে বিভাস যখন ওদের পাড়ার কাছের বড় রাস্তার মোড়ে এসে পেঁছিল তখন রাত প্রায় দেড়টা। এতক্ষণ রাস্তায় লোকজন বিশেষ চোখে পড়েনি, কিন্তু ওদিকের ওই গলির মুখে ছোট্ট একটা জটলা। কোনো গোলমাল হয়েছে নাকি ? লোকগুলো অত চুপচাপ কেন!

গা ছমছম করে উঠল বিভাসের। ধারেকাছে দু-একটা রিকশা আছে, কিন্তু রিকশাঅলা নেই। একটু দোনামনা করতে করতে রাস্তা পেরুতে লাগল ও। ওই খোলার ঘরগুলো জলকাদা মেখে পড়ে আছে, দরজার সামনে কেউ নেই! এই ক'দিন ওদের দেখে দেখে কয়েকজন কেমন যেন মুখচেনা গোছের হয়ে

গিয়েছিল। এই ছমছমে পরিবেশে ওইসব চেনামুখের কাউকে দেখতে পেলেও বোধহয় এক ধরনের ভরসা পেত বিভাস।

আর একটু এগোতেই হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে পাঁচ-ছটা ষণ্ডামার্কা লোক এসে ঘিরে ফেলল ওকে। "কোথায় যাবেন?" প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই বিভাস আন্দাজ করল, এরা ছিনতাই পার্টি। সামনের লোকটা এবার ওর হাতটা খপ্ করে ধরে বলল, "চলুন।"

"কোথায়?" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল বিভাস।

"থানায়।" বলেই লোকটা একটা হ্যাঁচকা টান মারল। টান মারার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের লোকটা প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগাল ওর পিঠে। হাতটা ধরা না থাকলে বিভাস বোধহয় ছিটকে পড়ত মাটিতে।

কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ও বলল, "আপনারা কি পুলিশ?"

"হ্যাঁ, চলুন।" আর একটা ধাক্কা পড়ল পিঠে।

এই দুটো ধাক্কাতেই বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেল ও। একটু দূরে একটা কালো রঙের পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ছিনতাই-পার্টির বদলে পুলিশ দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হল বিভাস, কিন্তু ব্যাপারটা এতই আকস্মিক যে, কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বেরুল না ওর মুখ থেকে। পুলিশের গাড়ির দিকে ওকে আরো কিছুটা টেনে নিয়ে যাবার পরে বিভাস থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "থানায় নিয়ে যাচ্ছেন কেন আমাকে?"

সাদা পোশাকের পুলিশগুলো কোনো উত্তর দিল না, লাভের মধ্যে শুধু ধাক্কার মাত্রা বেড়ে গেল আরো। ওই ধাক্কাতেই পুলিশের গাড়ির পেছনের দরজার কাছে এসে গেল বিভাস। শেষ ধাক্কাটা পড়ার আগে গায়ের জোর, গলার জোর এক করে রুখে দাঁড়াল ও। "কী ভেবেছেন আপনারা? আমাকে এভাবে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন কেন? আমি কাছেই থাকি, বাড়ি ফিরছিলাম।"

"এত রাতে?"

"তাতে কী হয়েছে? নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম অনেক দূরে, তারপর বৃষ্টি, ট্রাফিক জ্যাম। দেরি হতে পারে না?"

যে-পুলিশটা বিভাসের হাত ধরে ছিল সে এবার খ্যাক্-খ্যাক্ করে হেসে উঠে বলল, "চলেন, থানায় গিয়ে আর একবার নেমন্তন্ন খাবেন।"

বিভাস ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে বলল, "এভাবে ভদ্রলোকদের হ্যারাস করার কোনো মানে হয় না। ছেড়ে দিন আমাকে।"

ঠিক এইসময় আর একটা সাদা পোশাকের পুলিশ কোত্থেকে একটা রোগা, কালো, লুঙ্গি-পরা লোককে টানতে টানতে নিয়ে এল। লোকটার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছিল দরদর করে। লোকটা হেড়ে গলায় হাউমাউ করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল তার আগেই খটাশ করে একটা লাঠির বাড়ি পড়ল লোকটার পিঠে,

সেইসঙ্গে পেল্লায় এক ধাক্কা।

গাড়ির দরজা খোলাই ছিল, দু'দিকের দুই বেঞ্চির দুই ধারে দু'জন গাট্টা-গোট্টা হিন্দুস্থানী পুলিশ, তারা অক্লেশে গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে নিল লোকটাকে।

অ্যাকশনের বোধহয় একটা নিজস্ব গতি আছে। পুলিশটা হঠাৎ বিভাসের দিকে লাঠি উঁচিয়ে বলল, "ফুর্তি করতে এসে ধরা পড়ে এখন ফালতু কথা! ভেতরে ঢুকবেন, না কি—।" বিভাস আর কোনো কথা না বলে উঠে পড়ল গাড়িতে।

বেঞ্চির দুটো সারি এমনকি মধ্যিখানের জায়গাটাও সন্দেহজনক লোকজনে ভর্তি। মদের উৎকট গন্ধে বমি পেয়ে যাচ্ছিল বিভাসের। হঠাৎ কোণের দিকে চোখ যেতেই ও দেখতে পেল, তিনটে মেয়েছেলে বসে আছে। একটার মুখ চেনা-চেনা। বিভাস পরিষ্কার বুঝতে পারল কোত্থেকে এদের তোলা হয়েছে। তারপরেই ভয় আর দুর্ভাবনায় ওর গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। থানা-পুলিশ যখন হল তখন এ-ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে না। জানাজানি হবেই, আর জানাজানি হলে কেউ আর আসল কথাটা বিশ্বাস করবে না। লোকে কেচ্ছা ভালবাসে, পাঁচমুখে ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাটা কী চেহারা নেবে ভাবতে গিয়ে বুক কেঁপে উঠল ওর।

আরো কয়েকটা লোক তোলার পরে গাড়ি ছাড়ল। তারপরেই আর এক দফা চিৎকার-চেঁচামেচি। মেয়েছেলে-তিনটে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে যাচ্ছেতাই মুখ খারাপ করতে শুরু করে দিল। দাঁত বার করে ওদের চটিয়ে দিয়ে মজা পাচ্ছিল দু-তিনজন পুলিশ।

মিনিট-পনেরো বাদে থানা এসে গেল। থানার সামনে ঝকঝকে আলো। এত আলোর মধ্যে মুখ তুলে কারও দিকে তাকাতে পর্যন্ত সঙ্কোচ হচ্ছিল বিভাসের। প্রতি মুহূর্তে ভয় করছিল, এই বুঝি চেনা কেউ দেখে ফেলল ওকে।

থানার একটা লম্বাটে ঘরে ঢোকানো হল গাড়ির সবাইকে। বিভাস কোণের দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। আধঘণ্টা পরে ওর ডাক পড়ল ও সি-র ঘরে। ও সি গম্ভীরভাবে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখল, তারপর একটা হলদেটে খাতা আর পেনসিল টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম?"

বিভাস এবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে বলল, "বিশ্বাস করুন আমি এর মধ্যে নেই, নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফিরছিলাম।"

ও সি পেনসিলের শিস ব্লটিং পেপারের ওপর ঘসতে ঘসতে বলল, "এসব কথা কাল কোর্টে বলবেন। থাকেন কোথায়?"

বিভাসের গলার স্বরে চিড় ধরে গিয়েছিল, কোনো মতে বলল, "যেখান থেকে

আমাকে ধরা হয়েছে তার কাছেই আমার বাড়ি, শ্রীনিবাস রো, এই দেখুন আমার বাড়ির ইলেকট্রিক বিল।"

ইলেকট্রিক বিল আজকেই জমা দিয়েছে বিভাস, প্রমাণ হিসেবে কাউণ্টার-পার্টটা এগিয়ে দিল ও। কিন্তু কাগজের ওই টুকরোটা সম্পর্কে কোনোরকম আগ্রহ দেখাল না ও সি।

মরিয়া হয়ে শেষ অস্ত্র বার করল বিভাস, "আপনি ডি সি নর্থ অরিজিৎ গুহকে চেনেন তো, আমি ও'র ভাই হই।"

ও সি-র কপালে ভাঁজ পড়ল। "আপন ভাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বাঁচার জন্যে বিভাস সামান্য একটু মিথ্যে কথা বলল। অরিজিৎ গুহ ওর আপন নয়, জ্যেঠতুতো দাদা। কিন্তু এই কথাটায় বোধহয় একটু কাজ হল। ও সি নরম হয়ে বসতে বলল ওকে। তারপর ইলেকট্রিক বিলের কাউণ্টারপার্টে চোখ বুলিয়ে এত রাত্তিরে বাড়ি ফেরার বিপদ সম্পর্কে সস্নেহে কিছু উপদেশ দিল।

ছাড়া পেয়ে থানা থেকে যখন বেরিয়ে এল তখন আকাশে ভোরের প্রথম আলো ফুটে গেছে। ওর শরীর আর মন কেমন যেন আলাদা-আলাদা, কারও সঙ্গে কারও যোগ নেই। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ কিছুটা হাটার পরে পুরনো সেই বোধশক্তি ফিরে এল আস্তে আস্তে। আর তক্ষুনি ও টের পেল, যাচ্ছেতাই এক কেলেঙ্কারির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার অভিজ্ঞতাও কী ভয়ংকর।

মিনিট-প'য়তাল্লিশ বাদে যখন বাড়ির কাছে এসে পে'ছিল বিভাস তখন রাগ, বিরক্তি আর ক্লান্তিতে ওর সারা শরীরটা কেমন যেন দলা পাকিয়ে গেছে। দরজা খুলে প্রায় আঁতকে উঠে পারমিতা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে বিভাস চে'চিয়ে বলল, "রাবিশ। আজকেই এ পাড়া ছেড়ে দেব।" তারপর জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে, হাত-মুখ ধুতে ধুতে, চা খেতে খেতে তিন দফায় আস্ত ঘটনাটা শোনাল পারমিতাকে।

সব শুনে থ হয়ে গেল পারমিতা। ইশ্। কী সাংঘাতিক! যদি তোমাকে থানা থেকে না ছাড়ত!"

উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় কাল সারা রাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি পারমিতা। কী হল? এরকম তো কখনো হয়নি! তবে কি ওর···। খারাপ কথা ভাবতে না চাইলে দুর্ভাবনার মাত্রা বেড়ে যায়। ছটফট করতে করতে কাল রাত্তিরে ও কতবার যে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল···।

দুশ্চিন্তা কেটে গেলে ভয়ংকর এক ক্লান্তি নেমে আসে সারা শরীরে। সেই ক্লান্তিতে এখন দুজনেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। বিভাস আর অফিসে গেল না! দুপুরের খাওয়া সেরে একটা লম্বা ঘুম দিল ওরা। বিকেলে চা খাওয়ার সময় পারমিতা টের পেল, যাচ্ছেতাই রাত্তিরের স্মৃতিটা বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেছে। কিন্তু বিভাস কিছুই ভুলতে পারছিল না।

সূর্য বোধহয় ডুবে গেছে, কিন্তু রোদ্দুরের লালচে আভাটা এখনো ঘরের মধ্যে। একটা সুখের হাই তুলে পারমিতা বলল, "আচ্ছা, পুলিশের গাড়িতে যে মেয়েটাকে তোমার চেনা-চেনা লেগেছিল, তাকে কেমন দেখতে ?"

হাই তোলা দেখলে হাই ওঠে, বিভাসও একটা হাই তুলে বলল, "কেমন আবার, কেলটি দাঁত উঁচু।"

পারমিতা অমনি চকচকে মুখ করে বলল, "ও বুঝতে পেরেছি, খুব কালো, একটু মোটামতো, চুড়িদার পরে, তাই না ?"

বিভাস অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

পারমিতা ঝলমলে গলায় বলল, "ওই যে তিন নম্বর বাড়িটার সামনে দাঁড়ায়। ওর পাশে খুব ফর্সা, রোগামতন একটা মেয়ে থাকে না ?"

বিভাস আরো অবাক হয়ে বলল, "কে কোথায় দাঁড়ায়, কে কী পরে, সব তোমার মুখস্থ দেখছি।"

"বাহ্ ! রোজই তো দেখছি, চিনব না ?"

"ওরাও তোমাকে চিনে ফেলেছে, একদিন গল্প করার জন্যে ডেকে নিয়ে যাবে।"

পারমিতা মজার গলায় বলল, "গল্প করতে চাইলে দোষ কি। অনেক কিছু বেশ জানা যাবে।"

গত প্রায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিভাস বোধহয় এই প্রথম হাসল। হেসে বলল, "ওখানে তুমি না গিয়ে আমি গেলে আরো অনেক কিছু জানতে পারব। যাব ?"

পারমিতা হেসে ফেলে বলল, "যাও না, এক্ষুনি যাও।"

বেলাশেষের চমৎকার লালচে আভা ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যেতেই অন্ধকার নামল। উঠে গিয়ে আলো জ্বালল পারমিতা। তারপর দুটো হাত কানের পাশ দিয়ে ওপরে তুলে আড়ামোড়া খেয়ে বলল, "আজ যা ঘুমিয়েছি না, রাত্তিরে আর ঘুম আসবে না, চলো না একটু বেড়িয়ে আসি।"

"আবার ?"

"আবার কি, তুমি কি আর কখনোই বেড়াতে যাবে না।"

"কেন যাব না, তবে এ-বাড়ি আমি ছাড়ব।"

"ছেড়ো তবে এখনই তো আর ছাড়ছ না।"

আধঘন্টাটাক বাদে বাড়ি থেকে বেরুল ওরা। কয়েক পা হাঁটার পরে বিভাস হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "চলো আজ পেছনদিকের রাস্তা ধরে হাঁটি, বেড়ানোও হবে আবার দেখাও হবে ওদিকটা।"

পেছনদিকের রাস্তাটা সত্যিই চমৎকার, যত হাঁটছিল ততই ভাল লাগছিল ওদের। বেশ নিরিবিলি, আর দুদিকে ঝাঁক বেঁধে বাড়ি উঠেছে। কয়েকটা বাড়ি তো তাকিয়ে দেখার মতো। তারিফ করতে করতে সামান্য আফসোসের গলায় বিভাস বলল, "এসব বাড়ি কারা বানায় কে জানে! এক-একটা বাড়ির দাম কমসে কম লাখ-দশেক টাকা হবে।"

যে শেয়ালটা আঙুর ফল টক বলেছিল, ঠিক তার মতো গলা করে পারমিতা বলল, "এত বড়-বড় বাড়ি আমার একটুও ভাল লাগে না, আমার পছন্দ ছোট্ট ফ্লাট, হবে বেশ কমপ্যাকট। এই, তুমি প্রসাদবাবুকে ফোন করেছিলে?"

বিভাস একটু থেমে একটু কেশে বলল, "করব।"

"আর তুমি করেছ, এই নিয়ে একশো দিন বললাম!" বলে অন্যদিকে মুখ ফেরাল পারমিতা।

বিভাস জবাব দিল না, কী-ই বা আর বলার আছে! তবে এই প্রসাদবাবু লোকটা আস্ত একটা হারামজাদা। ফালতু সব ফ্লাট বানিয়ে বড়-বড় কথা বলে আর চড়া দামে বেচে। ফ্লাটের টোপ পারমিতা বহুকাল হল গিলে বসে আছে, কিন্তু যেহেতু বিভাসের পকেট—।

মনে মনে নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিভাস একটু এগিয়ে গিয়েছিল, পারমিতা সামান্য পেছনে। দুদিকের খোলা মাঠে তরতর করে বেড়ে উঠেছে পয়সাঅলা মানুষদের শখের বাড়ি। তবে লোকগুলোর রুচি আছে বলতে হবে। আর্কিটেকচারের এরকম ফলন আগের যুগে ছিল না।

পারমিতা স্বপ্নের ফ্লাটের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পরে এগিয়ে এসে বলল, "আর কতটা যাবে, ফেরো এবার, এদিকটা একদম ফাঁকা।"

বিভাস সামনের দিকে আঙুল তুলে বলল, "আরে ওই তো একটা বড় রাস্তা দেখা যাচ্ছে, কাছাকাছি কয়েকটা দোকানপাটও আছে, চলো না আর একটু এগিয়ে দেখি।"

একটু-একটু করে অনেকটা হাঁটার পরে বড় রাস্তা এল। বড় রাস্তার চলন্ত একটা বাসের দিকে তাকিয়ে খুশির গলায় বিভাস বলল, "যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, বাস চলছে। এবার থেকে এদিক দিয়েই যাতায়াত করব।"

"মানে?"

"মানে আবার কি, ওই থার্ড ক্লাস রাস্তাটা আর মাড়াব না।"

পারমিতা হাসতে হাসতে বলল, "এ তো তোমার চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো হল।"

"কেন ?"

"তা নয়ত কি, দশ মিনিটের পথ ছেড়ে তুমি একঘন্টার রাস্তা ধরছ।"

"ন-না, রিকশায় চাপলে দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব।"

প্রমাণ দেবার জন্য রিকশার খোঁজ করল বিভাস, কিন্তু কোথাও রিকশা পেল না। সিগারেটের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করাতে লোকটা শেষ কথা বলার ঢঙে বলল, "এখানে রিকশা পাবেন না।"

এখানে আসার সময় বেশ লেগেছিল, কিন্তু ফেরার মুখে ধু-ধু রাস্তা আর মাঠের দিকে তাকিয়ে দমে গেল বিভাস। অগত্যা বাস। একটা পালটে আর একটা, সেটা পালটে আরো একটা, সেটা পালটে আরো একটা, তারপর আবার। সামান্য পথ, তবে গোল হয়ে ঘুরে এদিকের রাস্তার মোড়ে পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে গেল।

এই রাস্তাটা এরমধ্যেই কিছুটা পুরনো হয়ে গেছে ওদের কাছে। কয়েকজন রিকশাঅলাও চেনা। বাস থেকে নামতেই চেনা রিকশার একটা এগিয়ে এল।

রিকশায় উঠে ওই খোলার ঘরগুলোর দিকে তাকাল পারমিতা। রিকশা একটু এগোতেই ও বিভাসকে খোঁচা মেরে বলল, "দেখ দেখ, সিনেমার ওই নায়িকার মতো মেয়েটা কী সাজান সেজেছে। কোটা প্রিন্টটা বেশ দামী কিন্তু। বাব্বা, আজ আবার নাকছাবি পরেছে। ইমিটেশন, না ?"

বিভাস অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কী করে বলব !"

রিকশা আর একটু এগোতেই পারমিতা প্রায় হৈ-হৈ করে উঠল—"আরে ওই তো সেই মোটামতো কালো মেয়েটা, তবে তুমি যে বললে ওকে পুলিশে ধরেছে।"

বিভাস হিস-হিস করে বলল, "কী হচ্ছে কী ?"

অন্যান্য দিনের মতো আজকেও বিভাসের ধমকানিকে কোনো পাত্তা দিল না পারমিতা। খোলার ঘর পেরিয়ে রিকশা এগোতেই ও মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ওদের।

বিভাস আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কনুই দিয়ে পারমিতার পাঁজরে একটা খোঁচা মেরে বলল, "অসভ্যের মতো তাকিও না তো, পাগলামিরও একটা সীমা আছে।"

ধাক্কায় বেশ জোর ছিল, ব্যথা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল পারমিতা। তার-পর কী যেন বলতে গিয়ে কিছুই বলল না।

টুং-টুং করে করে রিকশা আরো কিছুটা গড়িয়ে যাবার পরে বিভাস ওকে সহজ করার জন্য বলল, "রোববার বহুরূপীর থিয়েটার দেখতে যাবে ?"

পারমিতা কোন উত্তর দিল না।

"টিকিট কাটতে দিয়েছি।"

পারমিতা এবারও উত্তর দিল না, তারপর রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

পাক্কা দুটো দিন লেগে গেল পারমিতার মুখ থেকে অল্প অল্প করে কুয়াশা কেটে যেতে। তারপরেও একটু ছিল, সেটুকু গেল থিয়েটার দেখার পরে। এ-সব থিয়েটারের অধিকাংশ দর্শকের চেহারা, পোশাক-আশাক আর কথাবার্তা কেমন যেন অন্যরকম। নাটক নিয়ে ভালমন্দ বলাটাও অন্য ধাঁচের। সবাই বেশ আস্তে আস্তে কথা বলছিল, একজন ছাড়া। এই লোকটা মাঝবয়েসী, মাথায় একগাদা কাঁচাপাকা চুলের ঝোপ। পরনে মেটে রঙের পাঞ্জাবি আর পাজামা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মুখে ইয়া বড় চুরুট। লোকটা তার পাশের নির্জীব চেহারার লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু এত জোরে যে কাছাকাছি আরো দশ-পনেরোজন দিব্যি শুনতে পাচ্ছিল সব কথা। কথাগুলো এইরকম : এই যে ফর্ম, স্ট্রাকচার আর আর্টিস্টিক স্টেটমেন্টের মুড —তোমার ওই কনসেপচুয়াল কনটেন্ট থেকে আলাদা হলেই মুশকিল। আমি এখানে অবশ্য আশাও করিনি যে···আসলে প্যারিস এখন যে স্টেজিং আর প্রোডাকশানের স্ট্যাণ্ডার্ড সেট্ করেছে···উপায় নেই, সত্যি বলছি কোনো উপায় নেই, তুমি যদি আজকের মানুষের সেন্স অব সেন্সলেসনেস মঞ্চে আনতে চাও তবে সেকেলে র‍্যাশনাল ডিভাইস তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই হবে। কী, তাই না ?

ভদ্রলোক এইসব বলতে বলতে পারমিতার পাশে আসতেই শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে পারমিতার গা ছমছম করে উঠল। ও কিন্তু কথাগুলোর একটা বর্ণও বুঝতে পারছিল না, কিন্তু কেন জানে না মনে হচ্ছিল প্রতিটি শব্দই অভ্রান্ত। তবে ভদ্রলোকের কাশিটা অদ্ভুত! খাচ্ছেন চুরুট, কিন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে কাশির শব্দ শুনলে মনে হয় কোনো বিড়িখেকো বুড়ো কাশছে !

রাস্তায় নেমে বিভাস জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগল নাটকটা ?"

পারমিতার বেশ ভাল লেগেছে, কিন্তু মিনমিন করে বলল, "ভাল, তবে বোধহয় বেশ কঠিন, না ?"

মেটে রঙের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোকের কথাগুলো এখনো বিভাসের কানে বাজছিল। একটু থেমে ও বলল, "হ্যাঁ, একটু কঠিন তো হবেই !"

মোটামুটি নিরিবিলি চওড়া রাস্তার একপাশে খোলা সবুজ মাঠ। এই মাঠের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এক ধরনের ভাল লাগা তৈরি হয়ে যায়। ভাল লাগা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল তারা-ঝলমলে আকাশ আর ফুরফুরে হাওয়া। রাস্তা পেরিয়ে ওরা ওদিকের ফুটপাথে গিয়ে উঠল।

সবুজ মাঠের একপাশে কেমন যেন মেলা বসে গেছে। ঠেলাগাড়ি আর ঝুড়ির মাথায় কার্বাইডের আলো জেলে নানা ধরণের মুখরোচক খাবারদাবার

বিক্রি করছে দোকানদাররা। তাদের ঘিরে রঙিন ভিড়।

পারমিতা হঠাৎ আদুরে-আদুরে গলায় বলল, "ফুচকা খাওয়াবে ?"

"চলো।"

ফুচকা খাওয়ার পরে পারমিতা বলল, "আলুকাবলি খাবে ?"

"খাও।"

এই দুটো জিনিসের কোনোটাই পছন্দ করে না বিভাস, কিন্তু ও এখন মধুসূদনদাদা। পারমিতা বেলুন কিনতে চাইলে বেলুনও কিনে দিত। দুদিন ধরে ওর মুখে যে কুয়াশা জমেছিল সেই কুয়াশার ছিটেফোঁটাও এখন আর নেই। বিভাস নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "যাক, তোমার রাগ তাহলে পড়েছে।"

পারমিতা ঠোঁট উলটে বলল, "ব্যথাটা কিন্তু এখনও আছে।"

"যাহ্ !"

"যাহ কী, ব্যথার চোটে পরশু রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারিনি। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। অত জোরে কনুই দিয়ে পাঁজরে কেউ মারে ?"

"ওটা মারা হয়ে গেল ?"

"তা নয়ত কী !"

ঘাসভর্তি মাঠের মধ্যে আরো কয়েক পা হেঁটে যাওয়ার পরে বিভাস খুব নরম গলায় বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল, "ওদের দিকে অত ঘুরে ঘুরে দেখাটা ঠিক নয়।"

সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেবার ঢঙে পারমিতা উত্তর দিল, "এইসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তুমি এত ভাব কেন বলো তো ! আমি একাই না, সবাই ওদের দেখে। রাস্তায় ও ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে দেখবে না ?"

মধুসূদনদাদা বিভাসকে ছেড়ে যাবার তাল করল এবার। ও কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক আগের গলায় বলল, "দেখবে না কেন, তবে দেখার তো একটা ধরন আছে। ওইভাবে ঘুরে-ঘুরে হাঁ করে দেখা—।"

"মোটেও আমি হাঁ করে দেখি না।"

মধুসূদনদাদা বিভাসকে ছেড়ে পালাল। বিশ্রী সেই রাত্তিরের থানা-পুলিশের ঘটনাটা হুড়মুড় করে মনে পড়ে গেল ওর। কয়েক পা গুম হয়ে হাঁটার পরে বিভাস বলল, "ওই পথ দিয়ে আমরা নিয়মিত যাতায়াত করি। ওরা হয়ত তোমাকে চিনেও গেছে, ওইভাবে তাকাতে দেখলে একদিন ঠিক যা-তা কথা শুনিয়ে দেবে, ওদের মুখ-খারাপ শোনো নি তো—!"

কথাটার কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না পারমিতার মধ্যে।

গীর্জার ছুঁচলো মাথার ওপর গোল চাঁদ উঠেছে। বিরাট আকাশের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত তারা ছড়ানো ! ফুটপাথের ঝাঁকড়া গাছ থেকে ফুলের গন্ধ

ভেসে আসছে সমানে। চমৎকার এই ছবিটাতে সামান্য একটা অভাব ছিল, সেটা দূর হল গীর্জার গম্ভীর ও সুরেলা ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসতেই। বাতাসের সঙ্গে এখন বোধহয় প্রেম, ক্ষমা আর করুণা বইছে, কিন্তু বিভাস কিছুতেই ঠিক আগের মতো সহজ হতে পারছিল না।

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে ঘোরার পরে বাড়ি ফেরার বাসে উঠল ওরা। ময়দানের চমৎকার দৃশ্য একটু-একটু করে পেছনে হারিয়ে যাবার পরে শুরু হল জ্যাম। বাসের চাকা একটু গড়ায় আর পাঁচ-দশ মিনিট থামে। বিরক্তিকর। নানা ধরনের হর্নের আওয়াজ আর এক্সহস্ট পাইপের ধোঁয়ায় বিভাসের অস্বস্তির মাত্রা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। চমৎকার ময়দান আর থিয়েটার যেন কত যুগ আগের ঘটনা।

জ্যাম কাটতে বহু সময় লেগে গেল। বাড়ির স্টপে বিভাস যখন নামল তখন বিশ্রী একটা অবসাদ ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ও কল্পনাও করতে পারেনি আর একটা বেয়াড়া ঝঞ্ঝাট ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওখানে।

বাস থেকে নেমে রিকশার দিকে এগোবার সময় দ্দম্ দ্দম্ দ্দম্ করে পর-পর তিনটে বোমা ফাটল খোলার ঘরগুলোর সামনে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ছুটোছুটি, কয়েকটা দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেল। বিভাস আর পারমিতা দৌড়ে এসে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল একদম।

আর কোনো গোলমাল নেই, কিন্তু নতুন করে আবার শুরু হতে কতক্ষণ! এই আশঙ্কাতেই বোধহয় এদিক-ওদিক লুকিয়ে-পড়া পথচারীরা রাস্তায় নামতে ভরসা পাচ্ছিল না। বোমার শব্দে থমকে গিয়েছিল কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি, গাড়িগুলো পেছনদিকেই ফিরে গেল আবার। একটু পরে একটা বাস সব জানলা তুলে দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এইভাবে আরো মিনিট-দশেক কাটার পরে ঝাঁপ ফেলা দোকানগুলো আধখানা ঝাঁপ আবার খুলল। দু-চারজন সাহসী লোক হনহন করে হাঁটতে লাগল রাস্তা দিয়ে।

আরো কিছুক্ষণ পরে মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে লোক চলাচল শুরু হল। এবার যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু রিকশার দিকে এগোবার মুখে বিভাস টের পেল ওর চপ্পলের একটা স্ট্র্যাপ খুলে গেছে। এতক্ষণের বিরক্তি, ক্লান্তি আর অবসাদের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো কী যেন রি-রি করে ছুটে গিয়ে ওর মাথায় জমা হল।

হাত তুলে ডাকতেই ওদিকের রিকশাটা এগিয়ে এল কাছে। আর রিকশায় উঠেই ছেলেমানুষের মতো গলায় পারমিতা রিকশাঅলাকে জিজ্ঞেস করল,

'কী হয়েছে গো ?"

বিভাস গর-গর করে উঠল—"চুপ করবে তুমি।"

বেশ গুছিয়ে বোধহয় উত্তর দিতে যাচ্ছিল রিকশাঅলা, কিন্তু ওদিকের ধমকানি কানে আসতেই চেপে গিয়ে রিকশা টানতে শুরু করে দিল। টুং-টুং করে রিকশা খোলার ঘরগুলোর কাছাকাছি আসতেই পারমিতা কেমন যেন অবাক বিস্ময়ে বলল, "দেখেছ কাণ্ডটা। একটু আগে ওদের ঘরের সামনে বোমা পড়েছিল অথচ মেয়েগুলো এখন দাঁত বার করে হাসছে!"

সেই রি-রি ভাবটা বিভাসের মাথা থেকে আবার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। অতি কষ্টে চুপ করে থাকল ও।

অন্যান্য দিনের মতো একটানা নয়, তবে পারমিতা বেশ কয়েকবার ঘুরে ঘুরে দেখল মেয়েগুলোকে, তারপর আবিষ্কারের উত্তেজনায় বলল, "আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, একটা মেয়ের কাছে দুজন আসে। সেই দুজনের মধ্যে এখন গোলমাল বেধেছে।"

একটা বিশ্রী কথা ঠোঁটের কাছে এসে গিয়েছিল, কোনোমতে সেটা গিলে ফেলল বিভাস।

সাড়া না পেয়ে পারমিতা বলল, "হ্যাঁ গো অনেকদিন আগে একটা উপন্যাসে এই ধরনের একটা ঘটনা পড়েছিলাম। সেকেলে ব্যাপার নিয়ে লেখা বই। একটা মেয়ের কাছে দুই বাবু যেত। হঠাৎ একরাত্তিরে মেয়েটার বাড়িতে দুই বাবুর মুখোমুখি দেখা। দুই বাবুরই অনেক পোষা গুণ্ডা ছিল, তারপর সে কি সাংঘাতিক মারামারি। মাঝখান থেকে সেই মেয়েটা—"

বিভাসের সারা গায়ে অদ্ভুত একটা জ্বালা ধরে গিয়েছিল। ইচ্ছে করছিলো রিকশা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে।

পারমিতা হঠাৎ সেই আদুরে গলায় বলল, "সিগারেট কিনতে গেলেই ওই দোকানদারটা তো খুব বকবক করে, ওকে একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করো না আসল ব্যাপারটা কী—।"

বিভাসের এতক্ষণের সব ধৈর্য ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে। ও রীতিমত চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'কী পাগলের মতো বকবক করে যাচ্ছ তখন থেকে। চুপ করবে ?"

চিৎকার শুনে রিকশাঅলা ঘুরে তাকাল একবার।

পারমিতার অভিমান নানা খাত থেকে আসে। তারমধ্যে একটা হল আড়ালে তুমি আমাকে যা খুশি বলো, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে বলবে কেন ?

উটকো একটা রিকশাঅলার মতো বাইরের লোক আর কে হতে পারে! সেই রিকশাঅলা মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই রাজ্যের অভিমানে গলা বুজে এল

পারমিতার। ও কোনোমতে বলল, "চুপ করব কেন? অন্যায়টা কী বলেছি?"

"অন্যায় নয়ত কী? দিনের পর দিন চব্বিশ ঘন্টা ওই এক কথা, ও ছাড়া আর কোনো কথা নেই তোমার মুখে।"

"বাজে বোকো না, তুমিই তো কথা তোলো।"

"না, কক্ষনো না। তোমার কৌতূহলগুলো অ্যাবনর্মাল।"

অভিমানের সুর কেটে এবার ঝগড়ার স্বর বেরুলো পারমিতার গলা থেকে। "কৌতূহলের আবার নর্মাল অ্যাবনর্মাল কী?"

বিভাস এ-পাশে মুখ ফিরিয়ে বলল, "এ-পাড়া আমি ছাড়বই।"

উলটোদিকে তাকিয়ে পারমিতা বলল, "ছাড়ো না, এক্ষুনি ছাড়ো, ছাড়লে আমি বেঁচে যাই।"

বাড়ি ফিরে দুজন দু-ঘরে ঢুকল। রাস্তার দিকের গ্রিল-ঘেরা ছোট্ট বারান্দায় আজ আর কেউ গেল না। অথচ জায়গাটা আজ আরো সুন্দর। রাস্তার আলো আর চাঁদের আলো একসঙ্গে এসে পড়েছে বারান্দায়। আধখানা-বানানো নির্জন বাড়িগুলো আজ যেন অলৌকিক।

পরদিন সকালে দুজনের মধ্যে যে-কথাগুলো হচ্ছিল সেগুলো কেমন যেন ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেওয়া। এইভাবেই বিভাস একবার বলল, "আজ আমি তাড়াতাড়ি বেরুব।"

কেন? কী ব্যাপার? কিছুই জিজ্ঞেস করল না পারমিতা। শুধু ও রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল সকাল-সকাল!

অন্যান্য দিনের চাইতে ঘন্টাখানেক আগেই অফিসের পথে রওনা হল বিভাস। অফিসের পথটা এখন অন্য, একটা রিকশা নিয়ে পেছনদিকের সেই পথটা ধরল ও। অফিস থেকে ফিরলও ওই পথ দিয়ে। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের ফলে ওর সময় গেল বাড়তি ঘন্টাদুয়েক। কিন্তু ও একটুও দমল না। বাড়ি ফিরেই খবরের কাগজ টেনে নিয়ে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপনগুলো পড়ল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর একটা বিজ্ঞাপনে লাল ডটপেনের দাগ দিল।

একই নিয়মে পর-পর তিনদিন চলার পরে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠল বিভাস। আজকাল বাস-ট্রামের যা অবস্থা, তার ওপর সেধে এই বাড়তি ধকল, কদ্দিন আর সহ্য হয়! কিন্তু সেই রাত্তিরের কুৎসিত অভিজ্ঞতার কথা ভাবলে এখনও ওর গা-হাত-পা জ্বালা-জ্বালা করে ওঠে। তার ওপর সেদিন আবার বোমা পড়ল, দৌড়তে গিয়ে চটি ছিঁড়ল। আগের বাড়িতে চিৎকার-চেঁচামেচি একটু বেশি ছিল, বাড়িও তত সুবিধের নয়, কিন্তু এইসব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা তো একেবারেই ছিল না।

আগের নিয়মে এই তিনদিনের সব কুয়াশা একটু-একটু করে একদম কেটে গিয়েছিল আবার। চারদিনের দিন পুরনো পথ ধরে অফিস যাওয়ার মুখে

টিপ্পনি কাটল পারমিতা—"কী, রাস্তাটার ওপর তোমার রাগ তাহলে পড়ে গেছে ?"

বিভাস হাসতে হাসতে বলল, "কিন্তু এবার থেকে বেড়াতে যাব পেছনের রাস্তা দিয়েই।"

হাসিটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে পারমিতা উত্তর দিল, "ভালোই তো !"

॥ ৪

রোববার একটু দেরি করে বিছানা ছাড়ে বিভাস। ঘুম অবশ্য সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর মতো একই সময়ে ভেঙে যায়। তবে আরো কিছুক্ষণ ঘুমের মতো করে পড়ে থাকা, আলসেমি করা, খবরের কাগজ পড়া, শুয়ে-শুয়েই বার-দুয়েক চা খাওয়া—প্রায় নিয়মের মধ্যে পড়ে গেছে। তারপরেও দেরি হলে বাজারে যাবার জন্যে তাড়া লাগায় পারমিতা। আজকেও লাগাল।

প্রায় ন'টা নাগাদ বাজারে বেরুল বিভাস। বাজার করতে কখনোই ওর তেমন ভাল লাগে না। কিন্তু ছুটির দিনে এই সময় পথে বেরিয়ে পড়তে পারলে খারাপও লাগে না। কোথাও কোনো তাড়া নেই। রোদ্দুরে, হাওয়ায় আর রাস্তার লোকদের চলাফেরায় কেমন যেন একটা ঢিলেমি। ছুটির দিনে সবারই বোধহয় মন-মেজাজ কিছুটা ভাল থাকে।

বাজার থেকে ফিরে এসে গায়ের পাঞ্জাবিটা একটানে খুলে ফেলে রান্নাঘরে মুখ বাড়িয়ে বিভাস বলল, "আর এক কাপ হবে ?" এটাও বোধহয় নিয়মের মধ্যে পড়ে গেছে। তবে এর পরেরগুলো তেমন আর নিয়মের ভেতর পড়ে না।

একটু বেশি বেলায় খেতে বসল ওরা। রেডিওতে কুইজের লড়াই চলছে। জানা উত্তরগুলো পারমিতা চটপট দিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু রেডিওর ভেতরে সেগুলো পৌঁছচ্ছিল না। কুইজ শেষ হলে পারমিতা বলল, "আজ কোথাও যাবে না ?"

চেয়ারে এক পা তুলে বসে খেতে খেতে বিভাস বলল, "ধ্যাত্ ! ছুটির দিন হলেই সিনেমা-থিয়েটার কিংবা কারো বাড়ি যেতে আর ভাল লাগে না।"

"চলো না এমনি কোনো জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।"

"এমনি কোনো জায়গা মানে তো সেই আউট্রাম, ওখানে কোনো ভদ্রলোক যায় না।"

"কেন ?"

"কেন আবার, দেখনি সব গাড়িবাবুরা মাঠের ওপর ফোল্ডিং চেয়ার পেতে

ট্রানজিস্টার বাজায়। রাবিশ্‌!"

রেডিওতে এখন সর্বজনস্নেহধন্যা অভিনেত্রী কাঁদতে কাঁদতে সংলাপ বলছে। সঙ্গে করুণ আবহসঙ্গীত। সংলাপগুলো শুনে নেবার পরে পারমিতা বলল, "তাহলে অন্য কোথাও চলো।"

"কোথায় ?"

খাওয়ার পরে শোবার ঘরে এসে পারমিতা কেমন যেন লাজুক-লাজুক মুখে বলল, "দক্ষিণেশ্বরে যাবে ?"

"দক্ষিণেশ্বরে !" অবাক হয়ে পারমিতার দিকে তাকাল বিভাস।

"কেন ওটাও তো ভারি সুন্দর বেড়ানোর জায়গা, ওখানেও তো গঙ্গা আছে।"

বিভাস সিগারেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "আরে ও গঙ্গা আমাদের জন্যে নয়, ও গঙ্গা হচ্ছে পুণ্যতোয়া। যাদের ধম্মেকম্মে মতি আছে তারা যায় ওখানে।"

দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে পারমিতা বলল, "বলো না, যাবে ?"

দুটো বালিশ টেনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে বিভাস বলল, "রেডিওটা এ-ঘরে নিয়ে এসো তো অতুলপ্রসাদী হচ্ছে।"

ছোট্ট একটা ঘুম, কিন্তু বেশ গাঢ়। মাঝখানে পারমিতা ঠেলেঠুলে বিভাসকে তুলে দিয়ে বলল, "ওঠো এবার, ওখানে যেতে হলে বিকেল থাকতে থাকতে যাওয়াই ভালো।"

"সত্যি তুমি যাবে ?"

"ওঠো না।"

আকাশ ঝলমল করছে দিনের আলোয়, কিন্তু রোদ্দুর বেশ নরম। বাড়ি থেকে বেরুতেই একটা রিক্‌শা পেয়ে গেল ওরা। রিকশায় উঠে বিভাস বলল, "ওদিক দিয়ে চলো, বাসরাস্তায়।"

"ওদিক দিয়ে গেলে দেরি হয়ে যাবে না ?"

"উঁহু।"

পারমিতা পালটা যুক্তি দেখাতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী মনে হওয়ায় কিছুই আর বলল না।

দুদিকে সেই আধখানা-বানানো সুন্দর-সুন্দর বাড়ির ঝাঁক আর খোলা মাঠ। মধ্যিখানে চওড়া রাস্তার শুধু গোড়াপত্তন হয়েছে। সেই রাস্তা ধরে রিক্‌শা এগুতে লাগল টুং-টুং করে। সিনেমা-থিয়েটার দেখতে গেলে ঠিক সময়ে পৌঁছনো নিয়ে ভেতরে-ভেতরে একটা অস্বস্তি থাকে মাঝেমধ্যে, আজ সে-সব নেই। খোলা মাঠ থেকে মিষ্টি হাওয়া ছুটে আসছিল সমানে।

বাসে ওঠার পরে এই হাওয়াটা ওদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ফাঁকা রাস্তায় বাস ছুটছিল মনের সুখে। এখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের দূরত্ব খুব একটা

নয়, ওরা তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেল।

বাস থেকে নামার পরে বিভাস গলা নামিয়ে বলল, "মন্দিরে-টন্দিরে ঢোকার তাল করবে না কিন্তু। বেড়াতে এসেছি, স্রেফ বেড়াব।"

দক্ষিণেশ্বরের বাতাস গায়ে লাগতেই বোধহয় পারমিতার চোখমুখ চকচক করে উঠেছিল। ও কোনো উত্তর না দিয়ে এগোতে লাগল সামনের দিকে। আরো কিছুটা যাবার পরে মন্দির আর গঙ্গা দেখা গেল। গঙ্গা থেকে ঠান্ডা বাতাস উড়ে আসছিল। খুব একটা লোকজন নেই চারপাশে, যারা আছে তাদের বেশির ভাগই বোধহয় পুণ্যার্থী। কয়েক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাও দেখা গেল। তাদের দিকে তাকিয়ে বিভাস বলল, "এরা আবার এখানে কেন! বোধহয় সাত্ত্বিক উপায়ে প্রেম করতে এসেছে।"

পারমিতার মধ্যে অল্প-অল্প ভক্তিভাব জেগেছিল, তাই কথাটা একটু দেরিতে ধরে জিজ্ঞেস করল, "কী রকম?"

"এরা নির্ঘাত প্রেম করার আগে আর পরে গঙ্গায় হাত ধুয়ে নেয়।"

"যাহ্! এখানে ওসব কথা বোলো না।" চাপা ধমকের গলায় বলল পারমিতা।

চওড়া গঙ্গার জল ছলছল করে বয়ে যাচ্ছিল। ওইদিকের জলে বেলাশেষের সূর্যের রঙ। দূরে ছোট্ট-ছোট্ট নৌকা কেমন কেমন যেন দুলকি চালে ভাসছে। হু-হু করে ছুটে-আসা ঠান্ডা বাতাস সারা শরীর-মন স্নিগ্ধ করে দিয়েছিল। অন্যরকম গলায় বিভাস একটু কেটে-কেটে বলল, "ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল, সাধু হব। হল না।"

মজার গলায় পারমিতা টিপ্পুনি কাটল, "এখনও তো হতে পারো।"

"নাহ্, আর উপায় নেই।"

"কেন?"

"স্ত্রীলোক-ট্রিলোক সঙ্গে থাকলে সাধন ভজন হয় না। রামকৃষ্ণ বলেছেন, পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার-তেঁতুলের মতো। আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে যেমন জল আসে, সেইরকম। তুমি জুটেছ, আমি আর কী করে সাধু হব বলো!"

"বাজে কথা, বিয়ে করলে সাধু হওয়া যায় না কে বলেছে তোমাকে? স্বয়ং রামকৃষ্ণই তো বিয়ে করেছিলেন।"

গঙ্গার জলে এখন সূর্যাস্তের লাল রঙ। সেদিকে তাকিয়ে শব্দ না করে একটুখানি হাসল বিভাস। যাঁর শ্রদ্ধাভক্তি আছে তিনি যদি এই মুহূর্তে ওই হাসি দেখাতেন বিভাসকে নিশ্চয়ই তাঁর করুণাময় বলে মনে হত।

লাগসই জবাব দিতে পেরে পারমিতার মধ্যে বেশ জিতে যাবার ভাব এসে গিয়েছিল। এমন সময় বিভাস ঠান্ডা অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, "রামকৃষ্ণ বিবাহিত

হলে কী হবে, তিনি তো জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। কীভাবে হয়েছিলেন জানো? বলেছিলেন, জিতেন্দ্রিয় হতে গেলে নিজের মধ্যে মেয়ের ভাব আরোপ করতে হয়। তিনি তা করেওছিলেন। অনেকদিন সখীভাবে ছিলেন। মেয়েদের কাপড়, গয়না-টয়না পরতেন। নিজেই বলেছেন, সেই জন্যেই পরিবারকে নিজের কাছে এনে আট মাস রাখতে পেরেছিলাম। দুজনে যেন মায়ের দুই সখী। একদিন তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো আমি তোমার কে? অমনি ঠাকুর উত্তর দিলেন, তুমি তো আনন্দময়ী।"

পারমিতা দুটো ভুরু কপালের মাঝখানে তুলে বলল, "উরিব্বাস! তুমি তো দেখছি অনেক কিছু জানো। এবার থেকে গেরুয়া পরে কথকতা করো মাঝেমধ্যে। কিছু আসবেও, আবার ফাঁকতালে গুরুগিরিও···।"

বিভাস একই রকমের শান্ত গলায় বলল, "প্রকৃত গুরু হওয়া অত সহজ নয়। এক পিঁপড়ে গিয়েছিল চিনির পাহাড়ে ···।"

"জানি জানি, ও গল্পটা জানি। সেই তো একদানা চিনি খেল, আর এক-দানা মুখে নিয়ে যাবার সময় ভাবল পরের বার এসে আস্ত পাহাড়টাই নিয়ে যাব, তাই না?"

বিভাসের প্রশান্ত ভাবে চিড় ধরল সামান্য। একটু থেমে বলল, "সংসারটা বড় বিচিত্র জায়গা। এখানে থাকতে হবে বড়লোকের বাড়ির ঝিয়ের মতো—।"

"জানি জানি, ওটাও জানি।"

সামান্য চিড়টা আর এক ধাক্কায় এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পেঁছে গেল। বিভাস একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েক পা হাঁটার পরে বলল, "তবে যে যাই বলুক ভদ্রলোক আসলে ছিলেন একজন গ্রেট রিফর্মার, এই ধরো জাতপাত···।"

পারমিতা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "ওমা, এই তো পঞ্চবটী!" বলেই দুহাত জড় করে মাথায় ঠেকাল। তারপর পঞ্চবটী আর দক্ষিণেশ্বরের মাহাত্ম্য নিয়ে গদগদ গলায় অনেক কিছু বলে গেল। বলা কথাগুলো আবার বলতে শুরু করলে বিভাস থামিয়ে দিল ওকে। "চলো এবার একটু বসি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল যে।"

গঙ্গার ধারে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দুজনে পাশাপাশি বসল। চারদিকে অন্ধকার নেমে গেছে এখন। সামনে ঝাপসা আলোয় ছলাৎছল গঙ্গা, দূরে অন্ধকার। অন্ধকারে সেই নৌকাগুলো আর দেখা যাচ্ছে না, তার বদলে আলোর কয়েকটা বিন্দু। বিন্দুগুলো অন্ধকারে ভাসছিল। হাত ধরাধরি করে চুপচাপ বসে থাকতে ভীষণ ভাল লাগছিল পারমিতার। কিন্তু বাড়ির পেছনদিকের ওই রাস্তা ধরে ফেরার ঝঞ্ঝাটের কথা মনে পড়তেই বিভাস হাতটা টেনে নিয়ে বলল, "ওঠো এবার, ফিরতে হবে।"

"সে কী! এত তাড়াতাড়ি!"

বিভাস উঠে পড়ে বলল, "তাড়াতাড়ি কোথায়, ফিরতে ফিরতে বেশ রাত্তির হয়ে যাবে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হল পারমিতাকে।

মন্দিরের কাছে আলো ঝলমল করছে। পারমিতা চোখেমুখে অনুনয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, "চলো না একবার মন্দিরটা ঘুরে আসি।"

"ন্না, আজ না, আর একদিন। ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া মন্দির বোধহয় এখন বন্ধ হয়ে গেছে।"

ফিরে অনুরোধ করার আগে পারমিতা চমকে উঠে বলল, "দেখ দেখ সেই মেয়েটা!"

মন্দিরের কাছে থেকে একটা মেয়ে প্রসাদের ঠোঙা হাতে নিয়ে এদিকে আসছিল। পারমিতা তার দিকে প্রায় আঙুল তুলে বলল, "চিনতে পারছ না? একদম ধারের দিকের ঘরের সেই মেয়েটা, সেই যে সিনেমার নায়িকার মতো দেখতে।"

বিতৃষ্ণায় সারা গা জ্বলে উঠল বিভাসের। পুলিশের গাড়ির ভেতরের দৃশ্যগুলো হঠাৎই ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। আরো কিছুটা পথ মেয়েটার এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করতে লাগল বিভাস।

আরো উত্তেজিত হয়ে পারমিতা বলল, "চিনতে পারলে না? সেই মেয়েটাই তো। আসলে ও বেশির ভাগ দিন সালোয়ার-কামিজ পরে তো, আর চুল এরকম ছাড়া থাকে না, হর্স-টেল করে। আমি যাকে একবার দেখি না—কী বিশ্বাস হচ্ছে না?"

ভেতরে-ভেতরে এতক্ষণ ধরে ফুটছিল বিভাস, এবার ফেটে পড়ল। তালগোলপাকানো অর্থহীন অনেকগুলো শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। হঠাৎই ওকে এত চটে যেতে দেখে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল পারমিতা।

বিভাস আর দাঁড়াল না, হনহন করে হাঁটতে লাগল বাসস্টপের দিকে। পারমিতা প্রায় ছুটেও তাল রাখতে পারছিল না, পিছিয়ে পড়ছিল বারবার।

ফেরার বাসে অনেকগুলো সিট খালি পড়ে ছিল, কিন্তু বিভাস পারমিতার পাশে না বসে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে বসল। বাস বেশ জোরে ছুটছিল, চমৎকার হাওয়া আসছিল জানলা দিয়ে, কিন্তু বিভাসের ভাল লাগছিল না একটুও।

এদিকের রাস্তার ওই স্টপে এ-সময় সাধারণত রিকশা পাওয়া যায় না তবে আজ পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল বলেই বিভাসের রাগ পড়ে গেল কিছুটা। ঠান্ডা হাওয়া আরো ঠান্ডা হয়ে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছিল। আকাশ তারায় ভর্তি, ধপধপে এক টুকরো মেঘের আড়ালে চাঁদ

ভাসছে।

রিকশায় পাশাপাশি বসে বেশ কিছুটা পথ নিঃশব্দে যাবার পরে পারমিতা অভিমানের গলায় বলল "তুমি হঠাৎ এভাবে রেগে গেলে কেন বলো তো।"

বিভাস কোনো উত্তর দিল না।

"আজকাল তুমি কথায়-কথায় বড্ড রেগে যাও।"

বিভাস এবারও কোনো উত্তর দিল না।

"আশ্চর্য আমার দোষটা কী হয়েছে বলবে তো?"

"বেঁধে।"

রিকশা দাঁড়িয়ে পড়ল। বিভাস ভালভাবেই জানে বাড়িতে ঢোকার পরে পারমিতা এখন বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলবে না। তাই হল. খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে শুতে শুতে আরো ঘন্টাদেড়েক কিন্তু, এর মধ্যে একটা কথাও বলল না ও।

ছোট্ট-ছোট্ট ফুলের প্রিন্ট ধরানো বিছানার চাদরে চাঁদের আলো গড়িয়ে এসেছিল। ঘর অন্ধকার। তিনদিকের তিনটে বড়-বড় জানলা খোলা। ঢেউয়ের মতো মাপা বিরতিতে হাওয়া ঢুকছিল ঘরের মধ্যে। সিলিং-ফ্যানে ছিপ্‌ছিপ্‌ শব্দ।

তিন দফায় ওদিক থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পারমিতা বিভাসের ঠিক পাশে এল। তারপর ওর হাতটা রাখল বিভাসের পিঠের ওপর। ভাত খেয়ে হাত-ধোওয়া হাত এখনও বেশ ঠান্ডা। বিভাসের মনে হল, এই স্নিগ্ধতার সঙ্গে কোথায় যেন সেই পঞ্চবটী আর গঙ্গার ধারের মিল আছে। হাতটা কোমলভাবে বেশ কিছুক্ষণ পিঠে-বুকে খোরাবার পরে পারমিতা আরো কোমল গলায় বলল "রাগ করেছ?"

বিভাস কোনো উত্তর দিল না।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে পারমিতা একই ভঙ্গিতে একই কথা বলল আবার। বিভাসের এবার মৃদু গলায় বলতে হল, "উহুঁ।"

পারমিতা ওর গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেল, তারপর বলল "আচ্ছা ওরা খুব পুজোটুজো করে, না?"

বিভাস খাটের একেবারে ধারে শুয়েছিল। ওদিকে আর একটু সরলেই মেঝে, আর এদিকে পারমিতা। বিভাস শুধু টের পাচ্ছিল ওর নিজের শরীরটা আস্তে আস্তে কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠছে!

পারমিতা কেমন যেন সহানুভূতির গলায় বলল, "একটাবইতে পড়েছি ওরা খারাপ কাজ করে তো, তাই নিয়মিত গঙ্গাস্নান আর পুজোআচ্চা করে। তবে ওরা যে দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়িতেও যায়—জানতাম না।"

বিভাস বুঝতে পারছিল না সেই গঙ্গা এবং পঞ্চবটীর স্নিগ্ধতা পারমিতার

হাতের স্পর্শে এখনো আছে কি না! তবে ঠাকুরের কথা ওর মনে পড়ে গেল হঠাৎই। ঠাকুর বলেছেন; নিরাকার সাকার সব মানতে হয়। কালীঘরে ধ্যান করতে করতে দেখলাম, রমণী খান্‌কি। বললাম মা তুই এই রূপেও আছিস! তাই বলছি সব মানতে হয়। তিনি কখন কী রূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না।

এর মধ্যেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে ঝিরঝির করে। খোলা জানলা দিয়ে সামান্য শীতের হাওয়া ঢুকছিল ঘরের মধ্যে। জানলা দিয়ে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছিল। আকাশে জ্বলজ্বল করছে অগুনতি তারা। ঝিঁঝি ডাকছে, ওই ডাক ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। চাঁদের আলো এখন খাট থেকে নেমে মেঝের ওদিকে গিয়ে জড় হয়েছে।

পরিষ্কার আকাশের নীচে একটা আধখানা-বানানো বাড়িও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির মাথায় বাঁশের ডগায় বাঁধা ঝাঁটা আর ঝুড়ি। ঝাঁটা-ঝুড়ি বাঁধা থাকলে নাকি কুনজর পড়ে না বাড়ির গায়ে। তবে এখন সবকিছু ছেড়ে ওই দুটো বস্তুর ওপরেই বিভাসের দৃষ্টি জড় হয়েছিল। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিচিত্র এক অনুভূতি হল ওর। এই মুহূর্তে ওর সত্যি-মিথ্যের বোধ কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছিল। থানা-পুলিশ আর ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছিল স্নিগ্ধ গঙ্গার তীর আর পঞ্চবটীর স্মৃতি!

পারমিতা খুব উৎসাহের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল অনর্গল, কিন্তু একটা শব্দেরও মানে বুঝতে পারছিল না বিভাস।

পরের চিঠি

বুলটি কলকল করে গল্প করতে করতে যে মেয়েটিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তার নামই অনসূয়া। বুলটির নতুন বন্ধু। এই মেয়েটির সম্পর্কে অজস্র গল্প শুনেছে অনমিত্র, আর শুনেছে মেয়েটি সুন্দরী। তবে সুন্দরী মানে যে এই রকম পরমাসুন্দরী, কল্পনাও করতে পারেনি ও।

এত সুন্দরী মেয়ের চোখে চোখ রেখে বোধহয় বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। টুকটাক কথা বলতে বলতে বারবার মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল অনমিত্র। অবশ্য এই মুহূর্তে ওর বেশি কথা বলার দরকারই হচ্ছিল না। যা বলবার সব বুলটি একাই বলে যাচ্ছিল। বন্ধুর বিস্তর গুনগান করার পরে বুলটির হঠাৎ খেয়াল হল, আরে! দাদার সঙ্গে সে ভাবে তো আলাপই করিয়ে দেওয়া হয়নি বন্ধুর। মনে হওয়ার পরেই ও নিজের মুখে লাগাম টানল, তারপর মুখ খুলল আবার। "এই আমার দাদা অনমিত্র সেন, আর আমার বন্ধু অনসূয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। নাও তোমরা গল্প করো, আমি এক্ষুনি আসছি।"

ঠিক ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেছিল বুলটি, ঝড়ের মতোই কথা বলছিল এতক্ষণ আবার ঠিক ঝড়ের মতোই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনমিত্র বুঝতে পারল, নতুন বন্ধুর প্রথম দিন বাড়িতে আসা সেলিব্রেট করার আয়োজন করতে গেছে বুলটি। এটা বুঝতে পারার পরেই মনে হল এত তাড়াতাড়ি না গেলেই পারত! রোগাপটকা অনমিত্রের গায়ে শুধু স্যান্ডো গেঞ্জি। এই চেহারায় শুধুমাত্র গেঞ্জি পরে কোনো ছেলেরই বোধহয় পরমা-সুন্দরী কোনো মেয়ের সামনে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। অনমিত্র কেমন যেন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অস্বস্তির কোনোরকম চিহ্ন ছিল না অনসূয়ার চোখেমুখে। ও বেশ সহজ গলায় বলল "পড়াশুনা করছিলেন, এসে বিরক্ত করলাম, না?"

"না না, একটুও না। তাছাড়া এখন আমি পড়াশুনো করছিলামও না!"

"আপনাদের তো পরীক্ষা এসে গেল।"

"কোথায়! অনেক দেরি আছে, এখনও পাঁচ মাস বাকি।"

"পাঁচ মাস কি খুব একটা দেরি?"

অনমিত্রের মনটা সামান্য হায় হায় করে উঠল। গায়ে একটা পাঞ্জাবি কিংবা হাওয়াই শার্ট থাকলে এই প্রশ্নটার ও একটা লাগসই জবাব দিতে পারত।

ক্লাসের গুড বয়দের পেছনে লেগে মোক্ষম এই জবাবটা ওর প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্নটাকে ঝুলিয়ে রেখে তো আর জামা গায় দিয়ে আসা যায় না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে একটু হাসার চেষ্টা করে অনমিত্র বলল "পাঁচ মাস অনেক দেরি না? আরো মাসদুয়েক যাক তারপর পরীক্ষার কথা ভাবা যাবে।"

সত্যিকারের একটা বিস্ময় ফুটে উঠল অনসূয়ার বড়-বড় দুটো চোখে। "সত্যি! আপনি খুবই ভাল ছেলে। পরীক্ষার তিন মাস আগে তো ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তারপর পরীক্ষা যত এগিয়ে আসে তত শরীর খারাপ হয়।"

অনমিত্র ভাল ছেলেদের নিয়ে ঠাট্টা করতে চেয়েছিল কিন্তু অনসূয়া উলটো বুঝে ওকেই ভাল ছেলে ধরে নিয়েছে। ভুল ভাঙাবার জন্যে এবার একটু জোর দিয়ে অনমিত্র বলল, "আমি মোটেই ভাল ছেলে নই, আর সত্যি কথা বলতে কি পরীক্ষায় ভাল ফল করার কথা কোনোদিনই ভাবিনি আমি। প্রতি বছর প্রত্যেকটা সাবজেক্টে একগাদা করে ফাস্ট ক্লাস বেরোচ্ছে। তারপর? কী করছে তারা?"

ব্যাকবেঞ্চ গরম করা এই ধরনের কথাবার্তা বোধহয় অনসূয়ার কাছে একেবারেই অপরিচিত। অনমিত্রের কথা শুনে ওর চোখমুখের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। স্যাণ্ডো-গেঞ্জি-পরা অবস্থাতেই নিজের ব্যক্তিত্বকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে অনমিত্র বলল, "ভাল রেজাল্ট করলে একটা ভাল চাকরি পেতে সুবিধে হয় কিছুটা। আজকের দিনে আবার সে সুবিধেও পাওয়া যায় না সব সময়! আমার ভাল চাকরি পাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই, সুতরাং বেকার খেটেখুটে ভাল রেজাল্ট করে হবেটা কী?"

অনসূয়া অনমিত্রের কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করে নিয়ে বলল, "আপনার কথা অবশ্য আলাদা আপনি তো কবি!"

স্যাণ্ডো গেঞ্জির ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও অনমিত্র ওর ব্যক্তিত্বটাকে আস্তে আস্তে অনেকখানি তৈরি করে ফেলেছিল, কিন্তু অনসূয়ার এই শেষ কথাটায় ওর সেই ব্যক্তিত্ব ফেঁসে গেল একেবারে। ও আমতা-আমতা করে বলল, "বুলটি বলেছে বুঝি, ওর কথা আপনি একদম বিশ্বাস করবেন না।"

অনসূয়া এবার ঝলমল করে হেসে উঠে বলল, "আপনার কবিতা ও আমাকে পড়িয়েছেও। 'স্বপ্নের খেয়া' কবিতাটা আমার দারুণ ভাল লেগেছে।"

ওর কথায় একেবারে কাত হয়ে গেল অনমিত্র। শরীরের নীচের দিকে নামতে থাকা রক্তপ্রবাহ হঠাৎই বোধ হয় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে এসে ওর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় একটা বড় ট্রেতে প্রচুর খাবার-দাবার সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল বুলটি। তাই দেখে কেমন যেন আঁতকে উঠে অনসূয়া বলল, "উরিব্বাস! এত

খাবার কে খাবে!"

সেণ্টার-টেবিলের ওপর ট্রে নামাতে নামাতে থমকে উঠল, বুলটি বাজে কথা বলিস না তো! একটু আগেই তো বলছিলি ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। খেয়ে নে। তোদের হোস্টেলে কী খাবার দেয় সে তো আমার জানা আছে।"

অনমিত্র মৃদু গলায় সায় দিল, "কলেজ থেকে ফিরলেন এইমাত্র খেয়ে নিন।" তারপর "আসছি" বলেই টুক করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বারান্দায় বেরিয়েই ও লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল, তারপর সোজা কোণের ঘরে গিয়ে ওর প্রিয় সবুজ পাঞ্জাবিটা পরে নিল। তার পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠাসা একমাথা চুলে চিরুনি চালাল কায়দা করে। শুকনো তোয়ালে দিয়ে ঘসে ঘসে কিছুক্ষণ মুখ মোছার পরে মনে হল ওর পুরনো ব্যক্তিত্ব ফিরে এসেছে আবার।

ব্যক্তিত্ব ফিরে আসার পরেও ও ঘরের মধ্যে পায়চারি করল খানিকটা, তারপরে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফিরে এল ও ঘরে।

অনসূয়া আর বুলটি খেতে খেতে গল্প করছিল। ওকে দেখেই অনসূয়া বলে উঠল, "কই আপনি খান।"

ব্যক্তিত্ব ফিরে আসার পরে অনমিত্র এখন বেশ সপ্রতিভ। হাসতে হাসতে বলল "খিদে পেয়েছে আপনাদের আমি খাব কেন?"

না-না আপনি কিছু খান।"

অনসূয়ার কথাটার মধ্যে বেশ আন্তরিকতা ছিল। অনমিত্র একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে বলল আজ অনেক দেরিতে ভাত খেয়েছি।"

বুলটি কলেজের গল্প ফেঁদে বসেছিল বন্ধুর সঙ্গে। সেই গল্পটাই ও টেনে নিয়ে গেল আরও কিছুক্ষণ। এই সময়টুকু চোরা চাউনি দিয়ে স্বপ্নের খেয়া'র সমঝদার প্রকৃত সুন্দরীকে ভাল করে দেখে নিল অনমিত্র। অনসূয়ার সিঁথিতে কয়েক বিন্দু সিঁদুর। বুলটির কাছেও আগে শুনেছে বছর-দেড়েক হল বিয়ে হয়েছে অনসূয়ার কিন্তু সিঁথির লাল বিন্দুগুলো ওর চোখে পড়েনি এতক্ষণ।

বুলটি কথা বলতে একবার শুরু করলে আর বোধহয় থামতে পারে না। তখন থেকে ও গড়গড় করে কথা বলেই যাচ্ছিল। অধিকাংশ গল্পই কলেজের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। যে মেয়েগুলো একটু বেশি ডাঁটিয়াল তাদের নিয়ে কিছুটা পরচর্চাও করা হয়ে গেল একফাঁকে তারপরেই ছোড়দার কথা মনে পড়ল ওর। মনে পড়ল অনসূয়া ছাড়াও ও-ঘরে আর একজন আছে। সঙ্গে সঙ্গে ও অনমিত্রর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "জানো ছোড়দা অনুর না দারুণ গল্পের বই পড়ার নেশা। ও দুটো লাইব্রেরির মেম্বার আর প্রত্যেক মাসে একগাদা করে বই কেনে।"

অনসূয়া লজ্জা পেয়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বুলটি চোখ পাকিয়ে থামিয়ে দিল ওকে।

অনমিত্র তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল, "বাহ্! খুব ভাল নেশা! আমাকেও কিছু কিছু বইটই পড়ান না!"

অনসূয়ার লজ্জা-লজ্জা ভাবটা তখনও কাটেনি, মৃদু গলায় বলল, "আপনাকে আর কী পড়াব! আপনার বোধহয় সবই পড়া।"

সবুজ পাঞ্জাবি পরে অনমিত্রর ব্যক্তিত্ব এখন পাকাপাকি ভাবে ফিরে এসেছে। ও হাসতে হাসতে বলল, "আমাকে হঠাৎ আপনি বিদ্যাদিগ্‌গজ ভেবে বসলেন কেন? গল্পের বইটই পড়ার খুব ইচ্ছে, কিন্তু সবসময় হাতে পাই না বলে পড়া হয়ে ওঠে না।"

অনসূয়া হঠাৎ বলে উঠল আচ্ছা "দিগন্ত সেনগুপ্তের লেখা আপনার কেমন লাগে?"

এত সুন্দরী একটি মেয়ের মুখে হঠাৎ দিগন্ত সেনগুপ্তের মতো একজন থার্ডক্লাস লেখকের নাম শুনে অনমিত্রর খুব খারাপ লাগল। কিন্তু ও মনোভাব গোপন করে পালটা প্রশ্ন করল, "আপনার কেমন লাগে?"

"দারুণ। কিন্তু, কল্পরেখা'র মালবিকা চরিত্রটাকে কেমন যেন অবাস্তব লাগে না? বংশী সিংয়ের মতো একটা বাজে লোকের সঙ্গে ওর হঠাৎ অত ভাব হয়ে যাওয়াটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় না আপনার?"

হঠাৎ অথৈ জলে পড়ল অনমিত্র। "কল্পরেখা কার লেখা?"

রীতিমত অবাক হয়ে অনসূয়া জবাব দিল। "দিগন্ত সেনগুপ্তের। সাপ্তাহিক বনাঞ্চল'-এ ধারাবাহিক ভাবে বার হচ্ছে।"

"ও!"

অবাক ভাবটা অনসূয়ার এখন আরো বেড়ে গেছে। "আপনি পড়ছেন না উপন্যাসটা?"

দিগন্ত সেনগুপ্তকে নিয়ে ঠাট্টা করার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল অনমিত্রর, কিন্তু ও কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ধারাবাহিক উপন্যাস আমি ঠিক পড়তে পারি না। বই হয়ে বার হোক, তারপর না হয়—।"

অনসূয়া আবার 'কল্পরেখা'র রহস্যের মধ্যে ঢুকে গেছে! ও চকচকে মুখ করে বলল, "ইশ্! উপন্যাসটা এই সংখ্যায় এমন জায়গায় থেমেছে না···। রাগ হয়ে যায়—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, পিয়া কি ওর বাবাকে চিনতে পারবে?"

"গোয়েন্দা-উপন্যাস নাকি?"

"না-না, গোয়েন্দা না, তবে অসম্ভব টান লেখাটার। খালি কী হয়, কী হয় ভাব। ব্রজকিশোর আর মীনার সম্পর্কটা দারুণ হয়েছে। আমার মনে হয় সত্যি-সত্যি ওই ধরনের চরিত্র দেখেছেন লেখক।"

এ কথার উত্তরে কিছুই বলতে পারল না অনমিত্র, একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ভাসিয়ে দিল বাতাসে। অনসূয়া হঠাৎ কল্পরেখার রহস্য থেকে সরে এসে বলল, "আচ্ছা, আপনার 'স্বপ্নের খেয়া'র মেয়েটা কি সত্যি? সত্যিই কি ওইরকম কোনো মেয়ে শেষ বাসে একা বাড়ি ফেরে?"

সামান্য লজ্জা আর অনেকখানি খুশিতে গলা ছেড়ে হেসে উঠল অনমিত্র। তারপর হাসতে হাসতেই বলল, "আপনি লেখার মধ্যে অত সত্যি খুঁজে বেড়ান কেন বলুন তো? গল্প-কবিতা মানেই সব বানানো ব্যাপার।"

উত্তরে সন্তুষ্ট হল না অনসূয়া। "আপনারা—মানে লেখকেরা সব সময় কিন্তু সত্যি কথা বলেন না। একেবারে বানানো ব্যাপার কখনোই অত সত্যি-সত্যি ঠেকে না।"

দিগন্ত চৌধুরীর মতো অত জনপ্রিয় একজন লেখকের পাশে ঝুপ্ করে ওকে বসিয়ে দেবার জন্যে অনসূয়াকে রীতিমত ভাল লেগে গেল অনমিত্রর।

এটা সেটা নিয়ে আরো কিছুক্ষণ গল্প চলার পরে হোস্টেলে ফিরে গেল অনসূয়া।

॥ দুই ॥

সন্ধেবেলায় ছোটমামা বাড়ি ফিরে এলে ঘরে বসে আর সিগারেট খেতে পারে না অনমিত্র। তার ফলে দেড়-দু'ঘণ্টা অন্তর একবার করে ছাতে উঠতে হয় ওকে। আজ সন্ধেয় ছাতে ওঠার পরে সবকিছু হঠাৎই অসম্ভব ভাল লেগে গেল অনমিত্রর। কী সুন্দর বাতাস! আকাশ আজ আবার ছেয়ে গেছে তারায় তারায়। আর, সব তারার দ্যুতিতে যে মুখটা জ্বলজ্বল করে ভাসছিল ওর চোখের সামনে, সেটা অনসূয়ার। কী অপরূপ মুখ! বড়-বড় টানা চোখ, বাঁকানো ভুরু, গোলাপি গাল আর ঠোঁট। সিঁথিতে ছড়ানো বিন্দু-বিন্দু ওই লাল রঙগুলো যদি না থাকত! হিসেবের একটা আস্ত সিগারেট অনমিত্রর আঙুলের ফাঁকে পুড়ে পুড়েই শেষ হয়ে গেল।

সন্ধের আবছা আলোয় ফাঁকা ছাতের ওপর ঘুরতে ঘুরতে অনসূয়ার সঙ্গে নিজের বেশ কয়েকটা মিল খুঁজে বার করল অনমিত্র। যেমন, ওরা দুজনেই প্রবাসী। একজন হোস্টেলে থেকে পড়ে, একজন পড়ে মামাবাড়িতে থেকে। সাহিত্য ভালবাসে দুজনেই। আর, দুজনেই হয়তো দুজনকে…। আকাশ থেকে সুগন্ধী একটা কুসুম তুলে বুকের ভেতর ভরে ছাত থেকে নীচে নেমে এল

অনমিত্র।

খাওয়ার টেবিলে মামাতো বোন বুলটির কাছে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ও অনসূয়ার প্রসঙ্গ তুলতে চাইছিল। কিন্তু বুলটিটার কী মাথামোটা, ইঙ্গিত ধরতে না পেরে বারবার চলে যাচ্ছিল অন্য কথায়।

শেষে অধৈর্য হয়ে অনমিত্র বলে বসল, "তুই এ পর্যন্ত তোর যে কটা বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিস তার মধ্যে কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে শুধু ওই মেয়েটার।"

"কার? অনসূয়ার?"

মাথা একপাশে সামান্য কাত করল অনমিত্র।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে গল্পের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বুলটি। "সত্যি অনুর মতো মেয়ে হয় না একটাও। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—নানা উলটোটা। ভীষণ ভালো মেয়ে, আর দেখতে কী সুন্দর বলো? আমি তো ওকে বলেছি, তোর মতো রূপ পেলে আমি সিনেমায় নামতাম।"

বুলটিকে একটা খোঁচা দিতে গিয়েও থেমে গেল অনমিত্র। এখন খোঁচা দিলেই প্রসঙ্গ থেকে ও সরে যাবে। মৃদু গলায় শুধু বলল, "দেখতে-শুনতে মন্দ নয় বলেই বোধহয় তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে গেছে, না?"

"উরিব্বাবা! ওর বাড়িতে তো পাত্রপক্ষের লাইন পড়ে গিয়েছিল। কী বিরাট-বিরাট সম্বন্ধ এসেছিল।"

"ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে না ওর?"

"হ্যাঁ, ওর বর তো ইংল্যান্ডে থাকে।"

"তোর বন্ধু যাবে না ওখানে?"

"গিয়েছিল তো। এক মাস থেকেই পালিয়ে এসেছে।"

"সে কী রে!"

অদ্ভুত মেয়ে! ওর নাকি ইংল্যান্ড একদম ভাল লাগেনি। শুনে আমি বলেছি, তোর মাথায় নির্ঘাত ছিট আছে। তোর জায়গায় আমি হলে আমি আর দেশেই ফিরতাম না।"

অনমিত্র হাসতে হাসতে বলল, "সবাই তোর মতো পাগল নাকি!"

"কেন এর মধ্যে পাগলামির কী আছে? বুলবুলি তো সুইজারল্যান্ডে সেট্‌ল করে গেছে। তারপর আমার এক বন্ধুর দিদি তো অ্যামেরিকার সিটিজেনশিপ নিয়ে নিয়েছে। বিদেশে থাকার কত আরাম, ওই আরাম ছেড়ে কে এই পচা দেশে থাকতে চায় বলো?"

অনমিত্র ঠিক একজন জাতীয়তাবাদী নেতার ঢঙে বলল, "ফোর্থক্লাস সিটিজেন হয়ে পরের দেশে আরামে থাকার চাইতে নিজের দেশে কষ্ট করে থাকাও ঢের ভালো।"

একটু-আধটু ছাত্র-রাজনীতি-করা দাদার সঙ্গে তর্কে ঢুকে সুবিধে করতে পারবে না বলে বুলটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে 'ধুত্ত' বলে খাওয়ায় মন দিল।

খাওয়া শেষ হলে অনমিত্র সিগারেট খাওয়ার জন্যে আর একবার ছাতে গেল, তারপর নেমে এসে শুয়ে পড়ল পড়ার টেবিলের পাশে পাতা ছোট খাটটায়। অন্যদিন শোওয়ামাত্তর ঘুমিয়ে পড়ে ও, আজ কিন্তু ঘুম আসছিল না কিছুতেই। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা কবিতা তৈরি হচ্ছিল ওর মাথার মধ্যে। কবিতার নাম হতে পারে—কবিতার পাঠিকার প্রতি, কিংবা…।

প্রতিদিনের নিয়ম মতো সকালে ঘুম ভাঙার পরেও চোখ জ্বালা-জ্বালা করছিল অনমিত্রর। আর একটু ঘুমোতে পারলে ভাল হত, কিন্তু বাকি ঘুমটুকু ওর চোখ থেকে বহু দূরে সরে গেছে। ওর চোখের সামনে অস্পষ্ট একটা মুখের ছবি ভাসছিল, আর মাথার মধ্যে কবিতার কয়েকটা ভাঙা লাইন।

অনমিত্রর দিনটা আজ কেমন যেন অন্যভাবে শুরু হল। সবকিছুই ঘটছে প্রায় প্রতিদিনের মতো, কিন্তু চেনা কাজগুলো কখনোই ওর মনোযোগ টেনে রাখতে পারছিল না বেশিক্ষণ। হঠাৎ-হঠাৎ ও কোথায় যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল মনে মনে।

কলেজ আর আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরতেই বুলটি বলল, "অনু তোমার জন্যে একটা গল্পের বই পাঠিয়ে দিয়েছে।" সম্পূর্ণ নির্দোষ আর মামুলি একটা ঘটনা, কিন্তু বুলটির কথা কানে যেতেই অনমিত্রর বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছ্যাঁত করে উঠল। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে নিস্পৃহ গলায় ও বলবার চেষ্টা করল, "কোথায় ?"

"তোমার পড়ার টেবিলে।"

"কী বই ?"

"কে জানে! বিচ্ছিরি রকমের মোটা বই।"

অনমিত্র খুব ভাল করেই জানে এই একটা ব্যাপারে বুলটি একেবারে অকপট, কোনোরকম লুকোছাপা নেই ওর মধ্যে। পড়াশুনোর বইয়ের বাইরে ও সিনেমার কাগজ ছাড়া আর কিছু ছুঁয়েও দেখে না।

হাতের বই-খাতা নাচাতে-নাচাতে একটু অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে অনমিত্র নিজের পড়ার ঘরে চলে গেল। টেবিলের ওপর একটা অচেনা বই পড়ে আছে। কী বই কে জানে, কিন্তু ছুটে গিয়ে বইটা হাতে তুলে নেবার জন্যে বিচিত্র একটা আগ্রহ বোধ করল ও। আগ্রহটাকে আরো তীব্র করার জন্যেই বোধ হয় হাতের বই-খাতা আগে নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। তারপর আস্তে আস্তে ওই বইটা তুলে নিয়ে প্রাণমন দিয়ে অন্য এক স্পর্শ অনুভব করবার চেষ্টা করল। এই বইটা আর একজনের হাতে ছিল কিছুক্ষণ, সেই হাতের স্পর্শের রেশ কি এখনও

এখানে নেই !

নিজের অনুভবক্ষমতাকে তীব্রতর করার পরে ধীরে ধীরে বইয়ের পাতা ওলটালো অনমিত্র। দিগন্ত সেনগুপ্তর 'মনের কথা মনে'। রাবিশ্! এইসব আজেবাজে লেখকের লেখা অনসূয়া পড়ে কেন? না, মেয়েটার সাহিত্য-রুচি পালটাতেই হবে ওকে। পালটানো মনে হয় খুব একটা কঠিন হবে না। 'স্বপ্নের খেয়া'র মতো কবিতা যার ভাল লাগে তার নিশ্চয়ই কিছুটা সাহিত্যবোধ··· ।

মনের কথা মনের মধ্যে রেখে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল অনমিত্র আস্তে আস্তে। এই বইটা অনসূয়া নিশ্চয়ই পড়েছে, পাতায় পাতায় হয়তো ওর সুন্দর আঙুল-গুলোর স্পর্শ লেগে আছে। অনসূয়ার আঙুলগুলো কেমন মনে করার চেষ্টা করল অনমিত্র, কিন্তু মনে করতে পারল না। আলাদা করে আঙুলের দিকে কাল ওর চোখ যায়নি তবে তাতে কিছু এসে যায় না, ওর আঙুলগুলো নিশ্চয়ই খুব সুন্দর!

আরো কয়েকটা পাতা আলগোছে উলটে যেতেই হঠাৎ একটা খাম বেরিয়ে পড়ল। খামের মুখ খোলা। ওপরে অনসূয়ার নাম-ঠিকানা লেখা। নির্ঘাত ভুল করে চলে এসেছে, কিন্তু পরের চিঠি হাতে এলে না পড়ে রেখে দেওয়া খুব কঠিন। এ ক্ষেত্রে আরো কঠিন, কেননা চিঠিটা অনসূয়ার।

একটু ইতস্তত করে চিঠিটা পড়েই ফেলল অনমিত্র। প্রিয় অনুকে লেখা ওর বাবার চিঠি। ওপরে এলাহাবাদের ঠিকানা। ভদ্রলোকের হাতের লেখা সামান্য কাঁপা-কাঁপা কিন্তু অক্ষরগুলো বেশ স্পষ্ট। আর কী বিরাট চিঠি!

একটু কাব্য করার বাতিক আছে ভদ্রলোকের। চিঠির প্রথমে প্রায় দু-পাতা জুড়ে এলাহাবাদের অঝোর বর্ষার বর্ণনা। তারপর লিখেছেন একজন দুঃখী এবং সৎলোককে তিনি কীভাবে একটা চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন সে কথা। কর্তব্য বোধ এবং মানবিকতা নিয়ে বেশ কিছু ভারী-ভারী কথাও আছে। চিঠির শেষের দিকে সামান্য কিছু পারিবারিক সংবাদ।

অনমিত্রর মনে হল বইতে ছাপা কোনো একজন বিখ্যাত লোকের ব্যক্তিগত চিঠি পড়ছে। কাল অনসূয়া পাঁচরকম কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর বাবার গল্প করেছিল কিছুক্ষণ। সব মেয়েরেই বোধহয় বাবার ওপর একটা বাড়তি টান থাকে। এরকম একটা ধারণা থাকার জন্যেই হয়ত কাল ওর বাবাকে নিয়ে অত কথা শুনতে অনমিত্রর খুব একটা খারাপ লাগেনি! তাছাড়া অনসূয়া যা সুন্দর দেখতে ওর মুখে যে কোনো কথাই দিব্য মানিয়ে যায়।

চিঠিটা পড়ে অনসূয়ার বাবা সম্পর্কে অনমিত্রর ভালই ধারণা হল। ভদ্র-লোকের একটু কাব্যি করার ঝোঁক আছে, মোর‍্যাল টেক্সট বুকের মতো কথা বলতেও ভালবাসেন, তা যাই হোক—উনি ঠিক গেরস্থ গোছের বাবা নন। এই চিঠির আড়ালে আড়ালে অনসূয়ার একটা চেহারাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শান্ত,

স্নিগ্ধ একটি মেয়ে মন দিয়ে বাবার কথা শুনছে।

পরদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় অনমিত্রর বারবার মনে হচ্ছিল আজ অনসূয়ার সঙ্গে দেখা হবে বাড়িতে ফিরে। এরকম মনে হওয়ার পেছনে কোনো কারণ নেই, কিন্তু কেন জানে না ধারণাটা আস্তে আস্তে ওর সারা শরীরে শিকড় ছড়িয়ে ফেলল। আর ঘটলও তাই।

নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে দোতলায় উঠতেই অনসূয়ার গলার স্বর শুনতে পেল। অনমিত্রর চেঁচিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করছিল, জানেন আপনি আজ আসবেন আমি জানতাম। কিন্তু সমস্ত আবেগ শরীরের মধ্যে শক্ত করে আটকে রেখে ও বসার ঘরে ঢুকে বলল, "আরে! আপনি কখন এলেন?"

অনসূয়া ঝলমল করে হেসে জবাব দিল, "অনেকক্ষণ। ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।" অনমিত্রর লাফিয়ে উঠে বলতে ইচ্ছে করছিল আমারও তাই। রাস্তায় বারবার মনে হচ্ছিল বাড়ি ফিরেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু ও মনের কথা একটাও বলতে পারল না। ঠান্ডা ভঙ্গিতে সোফার ওপরে বসে বলল, "তারপর? আপনাদের পড়াশুনো কেমন হচ্ছে বলুন।"

নিজের কথা নিজের কানেই খট করে লাগল ওর, কী বোকার মতো কথা! অনসূয়া কিন্তু বেশ সহজ সরল গলায় বলল, "কিসের পড়াশুনো? কলেজের?" মুখের কথাগুলোর ওপর অনমিত্র বোধহয় কোনো জোর খাটাতে পারছিল না। ও নিজেকে আবার বলে বলতে শুনল, "হ্যাঁ।"

তাই শুনে বুলটি অসভ্যের মতো হেসে উঠে বলল, "কী ব্যাপার ছোড়দা তুমি কি লেকচারারের চাকরি পেয়ে গেছ নাকি! ছোড়দার কথাগুলো ঠিক এন সি জি-র মতো হচ্ছে না রে অনু?"

অনসূয়া একটু হেসে উঠেই সামলে নিল, তারপর বন্ধুকে একটা ছোট্ট ধমক দিয়ে বলল, "যাহ্! কী যা-তা বলছিস!"

উত্তরে ঠিক আগের ভঙ্গিতেই বুলটি হেসে উঠল আবার।

প্রাণপণে লাগসই কথা খুঁজে বেড়াচ্ছিল অনমিত্র, কিন্তু আজ ওর কী হয়েছে কে জানে, মুখের মতো একটা কথাও খুঁজে পেল না কোথাও।

অনসূয়া ওকে সাহায্য করল এবার। খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "ওই বইটা পড়েছেন?"

"কোনটা?"

"মনের কথা মনে।"

"ও হ্যাঁ, পড়া হয়ে গেছে।"

"সে কী!" অবাক হল অনসূয়া।

বেফাঁস কথাটা বলে ফেলেই নিজেকে সামলে নিল অনমিত্র। বইটা পড়া তো দূরের কথা, ভাল করে উলটেও দেখেনি ও। কিন্তু যা বলে ফেলেছে সেই

অনুযায়ী চলতে হবে। একটু হেসে বলল, "আমি খুব তাড়াতাড়ি পড়ি।"

মিথ্যে কথাটা বেমালুম বিশ্বাস করে গেল অনসূয়া। বইটা আমিও এক সিটিংয়েই শেষ করেছি। দারুণ ভাল বই না ?"

ঢোঁক গিলল অনমিত্র। না পড়ে যে কোনো বইকে ভাল বলা যায়, কিন্তু না পড়ে খারাপ বলা কঠিন। ঢোঁক গেলার পরে খুকখুক করে কাশল, তারপর বলল, "হ্যাঁ ভাল বেশ ভাল।"

প্রিয় লেখকের প্রিয় গল্পের জালে আবার জড়িয়ে গেল অনসূয়া। বিয়েবাড়ির সিনটা খুব মজার, হঠাৎ আলো নিবে ওই রকমই হয় না ?"

গল্পের বিয়েবাড়ির মজার দৃশ্য আন্দাজ করা অনমিত্রর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে বলে ফেলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ ওই রকমই হয়।"

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পরে অনসূয়া 'মনের কথা মনে' সযত্নে হ্যান্ড-ব্যাগে ঢুকিয়ে বলল, "পারি যদি কাল আবার আপনাকে একটা বই দেব।"

॥ তিন ॥

পরদিন বই পাঠাল না অনসূয়া। অনমিত্র ভেবেছিল তার পরদিন ও বই নিয়ে বুলটির সঙ্গে এ-বাড়িতে আসবে। কিন্তু এই ধারণাটা পুরোপুরি মিলল না। বুলটির হাতে বই এল ঠিকই তবে সঙ্গে ওর বন্ধু এল না।

বুলটি ছোড়দার হাতে বইটা ধরিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

বইটা ভ্রমণকাহিনীর। সারা হিমালয় চষে বেড়িয়েছেন এমন একজন সাধুর লেখা। বইটাতে সাদা-কালো অনেকগুলো ছবি আছে আর আছে ভাঁজ-করা একটা রঙিন ম্যাপ। কী ভাবে কোথায় যেতে হবে তার পথনির্দেশ।

ম্যাপটা খুলতেই মেঝের ওপর কী যেন একটা পড়ল ঠক্ করে। তাকাতেই দেখে একটা খাম। খামের ওপরে গোটা-গোটা হরফে অনসূয়ার ঠিকানা লেখা। বইয়ের মধ্যে চিঠিপত্তর রেখে দেওয়ার অভ্যেস অনেকেরই থাকে, কিন্তু কাউকে সেই বই দেওয়ার আগে ভেতরের পাতাটাতাগুলো তো একটু উলটে দেখতে হয়। মনে মনে অনসূয়াকে একটু শাসন করে দিল অনমিত্র, কিন্তু তারপরেই টের পেল খামের ভেতরের চিঠিটা ওকে বেশ টানছে।

দ্রুত হাতে খাম থেকে চিঠিটা বার করে ফেলল অনমিত্র। ছোট্ট একটা চিঠি চিঠির সঙ্গে একটা ফোটোগ্রাফ জেম্স্ ক্লিপ দিয়ে লাগানো। ফোটোটা একটা ছোট ছেলের। ছেলেটা পেছনে পাহাড় নিয়ে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। ছবির পেছনে বড়-বড় করে লেখা—উইথ লাভ ফ্রম রাজা।

রাজা নামটা অনসূয়ার কাছে অনমিত্রর বহুবার শোনা হয়ে গেছে এর মধ্যে। রাজা ওর ছোট ভাই, দার্জিলিংয়ে থেকে পড়ে। চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। লেখা আছে—দিদি তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি। তুমি আমার বার্থডেতে যে কেকটা পাঠিয়েছিলে সেটা খেতে খুব ভাল। তোমার কথা মতো কেকটা আমি বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছি। দুজন আন্টিকেও দিয়েছি। আমাকে আর একটা কেক পাঠাবে? ইতি রাজা।

নামের নীচে লাল, নীল, সবুজ পেনসিল দিয়ে একটা ফুল আর খরগোসের ছবি আঁকা। সুন্দর ছবি সুন্দর চিঠি। চিঠিটা বেশ কয়েকবার পড়ে ফেলল অনমিত্র। এই চিঠির পাশে সাধুর লেখা ভ্রমণকাহিনীটা কেমন যেন জোলো-জোলো। কিন্তু 'মনের কথা মনে' না পড়ার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল অনমিত্রকে। এখান থেকে ওখান থেকে খামচে-খামচে ভ্রমণকাহিনীর কিছুটা পড়ে নিল ও। এই বই নিয়ে অনসূয়া যদি কিছু বলে একেবারে চুপ করে থাকতে হবে না ওকে।

পরদিন অনসূয়া আবার এল, আর আসতেই বেশ জোর দিয়ে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলল অনমিত্র, "এই বইটাও এক রাত্তিরের মধ্যে শেষ করে ফেলেছি।"

ছোটখাটো যে-কোনো ব্যাপারেই অনসূয়া বোধহয় বেশ চমৎকার ভঙ্গিতে অবাক হতে জানে। ও চোখ বড়-বড় করে বলল, "বাব্বা আপনি কী তাড়াতাড়ি পড়তে পারেন!"

আমতা-আমতা করে অনমিত্র বলল, "না, ঠিক তাড়াতাড়ি…আসলে এই বইটা এত ইন্টারেস্টিং যে—"

"ইন্টারেস্টিং! আমার তো বইটা পড়তে পড়তে বারবার মনে হচ্ছিল, সাধুবাবা কায়দা করে ভূগোল শিখিয়ে দিচ্ছেন আমাদের।"

ওর কথায় গলা ছেড়ে হেসে উঠল অনমিত্র। "ভূগোল আপনার ভাল লাগে না?"

"একটু-আধটু মন্দ লাগে না, তবে বেশি ভূগোল চলে এলেই আমার মাথা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। এর চাইতে আপনার সাবজেক্টটা আমার ভাল লাগে। তবে ইতিহাসের সাল-তারিখগুলো কিছুতেই আমি মনে রাখতে পারি না।"

অনমিত্র হেসে উঠে বলল, "সাল-তারিখ মনে রাখার একটা ইজি প্রসেস আছে, আপনাকে আমি শিখিয়ে দেব একদিন।"

"সত্যি শিখিয়ে দেবেন?"

অনসূয়া এমনভাবে বলল যেন অনমিত্র গোপন কোনো মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওকে।

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে অনমিত্র আর বুলটি হেসে উঠল একসঙ্গে। হাসতে হাসতে অনমিত্র বলল, "আপনি একদম চিন্তা করবেন না, এমন কায়দা শিখিয়ে দেব যে, ইতিহাসের সাল-তারিখ ইচ্ছে করলেও আর কখনো ভুলতে পারবেন না।"

উত্তরে অনসূয়া যে কথাটা প্রতিদিন একবার করে বলে সেটা আবার বলে বসল—"আমাকে আপনি-আপনি করেন কেন বলুন তো! আমি তো বুলটির বন্ধু, আমাকে তুমি করে বলবেন।"

"কী করে বলি বলুন তো? বুলটির বন্ধু হলেও আপনি তো গিন্নিবান্নি লোক, আপনাকে কি তুমি বলা অত সহজ!"

অনমিত্রর কথা শুনে অনসূয়ার মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

পরিবেশ সহজ করার জন্যে অনমিত্র চটপট বলে উঠল, "ঠিক আছে, এখন থেকেই বলা শুরু করছি। পরের বইটা তুমি আমাকে কবে দেবে?"

এ কথাটারও কোন উত্তর দিল না অনসূয়া।

বুলটি চা আনতে গিয়েছিল। চা নিয়ে এসে মিইয়ে-যাওয়া আড্ডাটাকে একটানে সতেজ করে দিল। ফুলঝুরির মতো কথা ঝরে ঝরে পড়ছিল ওর মুখ থেকে। অসংখ্য বিষয় নিয়ে একটানা কথা চালিয়ে যাবার অসম্ভব একটা ক্ষমতা আছে ওর। কথায় কথায় অনসূয়াদের বাড়ির কথা উঠতেই মুখ খুলল অনসূয়া। অনমিত্র লক্ষ্য করেছে, বাড়ির কথা উঠলে অনসূয়া আর থামতে পারে না। ওর সেই চকচকে মুখটা ফিরে এসেছে আবার।

নিজের বাড়ির লোকদের নিয়ে একটানা গল্প শুরু করে দিল অনসূয়া। ওর বাবা চিকেন স্যাণ্ডুইচ খেতে ভীষণ ভালবাসে, মা আবার মুর্গি ছোঁয় না। ওর বাবার শখগুলো অদ্ভুত ধরনের—নতুন-নতুন ডিজাইনের অ্যাশট্রে কেনা তার মধ্যে একটা। ওদের বাড়িতে এত অ্যাশট্রে জমে গিয়েছে যে অ্যাশট্রে দিয়েই মস্ত একটা শো-কেস সাজানো যায়। অথচ বললে কেউ বিশ্বাস করবে না—ওর বাবা একদম সিগারেট খায় না। রাজার নাকি খুব কুকুর পোষার শখ, অথচ ওর মা পোষা কুকুর দেখলেও ভয় পায়।

অনসূয়া দম না নিয়ে এক কথা থেকে আর এক কথায় লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমনভাবে বাড়ির কথা বলছে যে অনমিত্রর মনে হচ্ছিল, ও বোধ হয় কাউকে শোনাবার জন্যে বাড়ির গল্প করছে না; সামনের শ্রোতা দুজন নেহাতই উপলক্ষ। কিন্তু কেউ সামান্য একটু আগ্রহ দেখালেই ওর উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছিল হাজারগুণ।

কারও মুখে স্রেফ কথা শুনে যাওয়া যে এত আনন্দের, অনমিত্র আগে কখনও জানতে পারেনি। অনসূয়ার কথাগুলো ও মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিল। নেহাতই ঘরোয়া কথা—বাড়িতে ছুটির দিন ওদের কী ভাবে কাটে, ছোট ভাইবোনের কী নিয়ে ঝগড়া বাধে, সেই ঝগড়া ও কী ভাবে মেটায়, সেবার পিকনিক করতে গিয়ে কী ধরনের মজা হয়েছিল, ছুটির সময়টুকু কী তাড়াতাড়ি কেটে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। অনসূয়ার বাবা, মা, ভাই, বোন অনমিত্রর কাছে একেবারেই অচেনা, তাদের জীবনযাত্রার কাহিনীর মধ্যে চমকপ্রদও কিছু নেই, কিন্তু সেইসব সাদা-

মাটা কাহিনী অনমিত্র কেমন যেন অভিভূত হয়ে শুনছিল। আসলে নিজের বাড়ির কথা বলার সময় অনসূয়ার চোখমুখ অসম্ভব ঝলমলে হয়ে ওঠে, লালচে-গোলাপি আভা আরো গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে যায় দু-গালে। ওকে দেখবে না ওর কথা শুনবে—সব সময় ঠিক করে উঠতে পারছিল না অনমিত্র।

আড্ডা তরতর করে গড়িয়ে গেল অনেকটা। দিনের আলো হঠাৎই ঝুপ্ করে নিবে যেতেই অনসূয়া বাড়ির কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, "ওমা সন্ধে হয়ে গেছে! হোস্টেলে ফিরতে হবে এবার।"

অনসূয়ার হোস্টেলের নিয়মকানুন একটু বেশি কড়া, সুতরাং ওকে আটকানো গেল না। বাসস্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল অনমিত্র। বাড়ি থেকে বাসস্টপ পাঁচ মিনিটের পথ কিন্তু অনমিত্রর মনে হচ্ছিল পথটা ফুরিয়ে গেল এক মিনিটের মধ্যেই। পথ চলতে চলতে ওদের মধ্যে বেশি কথা হয়নি, স্টপে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাসও এসে গিয়েছিল। 'চলি', বলে চলে গিয়েছিল অনসুয়া। কিন্তু ওই সামান্য পথটুকু হাঁটা আর মামুলি দু-চারটে কথা বলার স্মৃতি কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল অনমিত্রকে। এলোমেলো ভাবে এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ হাঁটার পর বাড়ির পথ ধরল ও।

॥ চার ॥

শরীর খারাপের অজুহাতে লাস্ট ক্লাস করতে চাইল না অনমিত্র। বন্ধুরা বলল, বাদ দে, আমরাও করব না। কফি-হাউসে চল্, একটা ব্ল্যাক কফি খেয়ে নিবি, দেখবি শরীর বাঘের বাচ্চার মতো ফিট হয়ে গেছে। কিন্তু তেমন জোরালো কোনো অজুহাতের কাছে যুক্তি, তর্ক, আবেদন ধোপে টেঁকে না। অনমিত্র বলল, "অসম্ভব শরীর খারাপ লাগছে, বোধহয় তেড়ে জ্বর আসবে। বিশ্বাস কর, দাঁড়াতে পারছি না।"

এই কথার পরে আর কোনো কথা চলে না। শরীর খারাপের ভান করে বন্ধুদের এড়িয়ে বাসে উঠে পড়ল অনমিত্র। বাস বাড়ির দিকে যত এগোচ্ছিল ওর বুকের কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছিল তত। এই কাঁপুনির সঙ্গে শরীর খারাপ বা জ্বরজারির কোনো সম্পর্ক নেই।

শেষ-দুপুরে বাড়ি ঢুকল অনমিত্র। নিঝুম বাড়ি, কোথাও কোনো শব্দ নেই। অথচ ও সারা রাস্তা অন্যরকম ভেবে এসেছিল। ভেবেছিল বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা গলার হাসি কিংবা কথা শুনতে পাবে। সিঁড়ির ধাপগুলো পেরুলেই অন্য একজোড়া মেয়েলি চটি দেখতে পাবে। তারপর··· তারপর···। কিন্তু পরের কথা পরে, আগের ধারণাগুলোর একটাও মিলল না

বাড়িতে ঢুকে। বাড়িটা এমনিতেই চুপচাপ, এই শেষ-দুপুরে আরো বেশি শান্ত হয়ে গিয়েছিল। বুলটি এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি। ঠিক কোন্ সময় ফেরে ও? এখন? না, আর একটু পরে? একটা স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিল অনমিত্র। কিছুক্ষণ বাদে বুলটি নির্ঘাত কালকের মতো ওর বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

কিন্তু কিছুক্ষণের জায়গায় বহুক্ষণ কেটে গেল। বুলটি আসছে না কেন? বেশ কয়েকবার জানলায় গিয়ে দাঁড়াল ও। এক-এক করে এ-পাড়ার অনেকেই ফিরে আসছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বুলটিরা নেই।

আরো অনেক সময় কেটে যাওয়ার পরে বুলটি ফিরল। বুলটি একাই। অনমিত্রর বিশ্বাস করতে কিছুক্ষণ সময় লাগল যে, বুলটি সত্যিই একা। তার পরেই কিছুটা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, তুই আজ ফিরতে এত দেরি করলি?"

প্রশ্ন শুনে অবাক হল বুলটি, তারপর চোখ বড়-বড় করে বলল, "দেরি কোথায়? আমি তো এই সময়েই ফিরি। তুমিই বরং আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ!"

উত্তর দিতে দিতে বুলটি চলে গেল নিজের ঘরে।

আশাভঙ্গের কষ্ট এবার হুড়মুড় করে চেপে ধরল অনমিত্রকে। কিছুতেই ও সুস্থির হতে পারছিল না। বারান্দায় কিছুক্ষণ পায়চারি করার পরে হঠাৎই কেমন যেন রাগ আর জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। লম্বা পায়ে ও বুলটির ঘরে ঢুকে বলল, "তোর বন্ধু অদ্ভুত ছোটলোক তো, আজ একটা বই দেবে বলেছিল, দিল না!"

আর একবার অবাক হল বুলটি, তারপর বলল, "আমার বন্ধুকে শুধু-শুধু ছোটলোক বলবে না তো, ওই তো তোমার বই।"

"কোথায়?"

"আমার হ্যান্ডব্যাগে।"

টেবিলের ওপর হ্যান্ডব্যাগ, ব্যাগের লম্বা পকেট থেকে উঁকি মারছিল একটা বই। সেটাকে একটানে তুলে নিয়ে অনমিত্র জিজ্ঞেস করল, 'এইটে?"

"হুঁ।"

অনমিত্র আর কোনো কথা না বলে বইটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলটির ঘর থেকে। বইটা হাতে নিতেই বিচিত্র এক রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়েছিল ওর শরীরে, মনে হচ্ছিল, এ বইটার মধ্যেও একটা চিঠি আছে। এমনও হতে পারে চিঠিটা অনসূয়াকে লেখা নয়, হয়ত অনসূয়াই লিখেছে, কাল সন্ধেয় হোস্টেলে ফিরেই লিখেছে, কিন্তু ও কাকে লিখেছে চিঠিটা! কাকে? অনমিত্রর হৃদপিণ্ডে রক্তের চাপ অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। বইটাকে শক্ত করে হাতের মুঠোয় চেপে

ধরে ও নিজের ঘরে চলে এল।

কী বই, কার লেখা, সে-সব নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। দ্রুত হাতে বইয়ের পাতাগুলো ও উলটে যেতে লাগল, তারপরেই একটা চিঠি পেল। কিন্তু চিঠিটা অনসূয়ার লেখা নয়, অনসূয়াকে লেখা।

অনমিত্রের হৃদ্‌পিন্ডে জমে-ওঠা রক্তস্রোত পুরনো নিয়মে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল আবার। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পরে বইয়ের বাকি পাতাগুলো উলটে গেল ও। না, আর কোনো চিঠি নেই। আজ দুপুর থেকেই নানা রকম উদ্ভট কল্পনা ওর মাথায় খেলে যাচ্ছিল, কিন্তু সেইসব কল্পনার একটাও সত্যি হল না।

সিগারেট ধরাল অনমিত্র, হিসেবের সিগারেট আজ একটু বেশিই খরচা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। সিগারেটে লম্বা কয়েকটা টান মেরে চেয়ারে বসে পড়ল ও।

বইয়ের চিঠিটা ওর হাতে ধরাই ছিল, এবার ও সেটার দিকে ভাল করে তাকাল। এয়ার-মেল, ওপরে টাইপ করে অনসূয়ার ঠিকানা লেখা। ঠিকানার মাথায় ইংল্যান্ডের টিকিট। নির্ঘাত অনসূয়ার বরের চিঠি। এটা আবিষ্কার করতেই রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠল অনমিত্র! এয়ার-মেলের মুখ খোলা, চিঠির আকর্ষণ একলাফে বেড়ে গেল অনেকখানি।

খোলা চিঠিটাও পড়ে ফেলল চটপট। বিরহকাতর প্রবাসী স্বামীর চিঠি যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি, তবে বড্ড সাধু-সাধু। একটাও অসভ্য কথা নেই কোথাও। সাবধানে থাকার জন্যে, ভালভাবে পড়াশুনা করার জন্যে কিছু মৃদু উপদেশ আছে। চিঠিটার বেশ কয়েকটা লাইন অন্য রঙের কালি দিয়ে কেটে দেওয়া। এমনভাবে নিব ঘষে ঘষে কাটা হয়েছে যে একটা অক্ষরও আর বোঝার উপায় নেই।

দু-রঙের কালি দেখে হঠাৎ কেমন যেন একটা খটকা লাগল অনমিত্রর। এ লাইনগুলো কে কেটেছে! অনসূয়ার বর, না অনসূয়া? কিন্তু অনসূয়া কাটতে যাবে কেন? সদ্য-বিবাহিতা অনসূয়ার কাছে প্রবাসী স্বামীর চিঠির প্রতিটি শব্দই তো ভীষণ প্রিয় হওয়া উচিত। নির্ঘাত ও বহুবার চিঠিটা পড়েছে, পড়ে পড়ে হয়ত মুখস্থই হয়ে গেছে। তাহলে?

জটটা ছাড়ার বদলে আস্তে আস্তে সেটা আরো জটিল হয়ে উঠল। চিঠির মাথায় মাস-আন্টেক আগের তারিখ বসানো, তার মানে বেশ পুরনো চিঠি। আর একটু গোয়েন্দাগিরি করার পরে অনমিত্র আবিষ্কার করল, চিঠির কালিটা পুরনো, কিন্তু যে কালি দিয়ে চিঠির লাইনকটা কাটা হয়েছে সেই কালিটা টাটকা। এটা কীভাবে হল!

চিঠির লাইনগুলো নিব ঘষে ঘষে এমন ভাবে কাটা হয়েছে যাতে কাটা

লাইনগুলোর একটা শব্দও কেউ উদ্ধার করতে না পারে। কিন্তু নিজের চিঠি কেউ কি এভাবে কাটে! অনসূয়া যদি কেটে থাকে তাহলে ও ধরেই নিয়েছে এই চিঠির আর একজন পাঠক আছে। সেই পাঠকটা কি অনমিত্র?

নিজের সঙ্গে কথা চালাচালি করে অনমিত্র ক্রমশ একটা রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ল। এখন আর কোনো সন্দেহই নেই যে অনসূয়া প্রত্যেকটা বইতে ইচ্ছে করেই নিজের চিঠি রেখে দিয়ে ওর কাছে পাঠায়। কিন্তু কেন?

অনসূয়া কি জানাতে চায় ওর বাড়ির সবাই অসাধারণ। দারুণ সুন্দর চিঠি লিখতে পারে, আর ও খুব সুখী। কিন্তু এ-সব কথা আলাদা করে জানাবার কী দরকার? অনমিত্র তো ওর বাড়ির গল্প খুব মন দিয়ে শোনে, কোনো ব্যাপারে কখনোই কোন সংশয় দেখায় না। তার পরেও এত চিঠি পাঠানো কেন?

ওর বাবার চিঠি, ছোট ভাইয়ের চিঠি পড়ে অনমিত্র এক ধরনের মজা পেয়েছিল, কিন্তু এই চিঠিটার মধ্যে সেই ধরনের মজার ছিটেফোঁটাও নেই। বরং আস্তে আস্তে কেমন যেন একটা বিরক্তি তৈরি হচ্ছিল ওর মধ্যে। অনসূয়া কেন শুধু শুধু ওর বরের চিঠি পড়াতে গেল ওকে। বিলেতের একটা ডাক্তার চিঠি লিখেছে তার বউকে, সেই চিঠি পড়ে ওর কী লাভ?

অনমিত্রর মনের মধ্যে যে বিরক্তিটা তৈরি হয়েছিল সেটা হঠাৎ ঘুরে গেল বিলেতের ওই ডাক্তারটার দিকে। অদ্ভুত লোক! বিলেতে বসে ডাক্তারি করছে আর বউ পড়ে আছে এখানে! অনমিত্র ডাক্তারটার জায়গায় চট করে নিজেকে একবার বসিয়ে নিয়ে ভাবল, এই অবস্থায় ও কী করত! করাকরির কিছু নেই, এত সুন্দর বউকে ছেড়ে দিয়ে ও সাহেবদের দেশে ডাক্তারি করতে পারত না। লোকটা নির্ঘাত গবেট, অরসিক, অনসূয়ার অযোগ্য।

সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা একটা ডাক্তারকে মনে মনে কিছুক্ষণ গালাগালি দিতে পেরে অনমিত্রর বেশ ভাল লাগল। তারপরেই উটকো একটা চিন্তা ছড়িয়ে পড়ল ওর মাথায়।

অনসূয়া হয়ত খুব কায়দা করে জানিয়ে দিল বরের সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব মধুর। এটা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়, কিন্তু অনসূয়া আগ বাড়িয়ে সে কথা কেন জানাচ্ছে ওকে? তবে কি…

ওর বুকের ভেতর থেকে মাঝেমধ্যে যে মৃদু বাজনার শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সেই শব্দ কি অনসূয়ার কানে পেঁছে গেছে!

এটা ভাববার পরেই ও কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ল। পৃথিবীতে এমন কিছু-কিছু ঘটনা আছে যেগুলো সম্পূর্ণ নিজস্ব নিয়মে শুরু হয়ে যায়। ঘটনার আবর্তে যারা পড়ে তাদের আলাদা ভাবে কিছুই করার থাকে না। শুধু ভেসে যাওয়া। ভাসতে ভাসতে মাঝেমধ্যে ঘটনাস্রোত দেখে চমকে

উঠতে হয় কেবল। এখন যেমন, অনমিত্র পেছনের দিকে তাকিয়ে একটু কেঁপে উঠল মনে মনে। ওর চোখের সামনে অনসূয়ার রঙিন সিঁথিটা ভেসে উঠছিল বারবার। সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, অনুচিতও বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে বিচিত্র সেই বাজনাটা বেজে উঠেছে কনে বারবার!

॥ পাঁচ ॥

অনমিত্রর মাইমা বাতের কষ্টে যত না ভোগেন তার চেয়ে ঢের বেশি ভোগেন বাতিকে। বাতিকের শেষ নেই, তার ওপর আছে পুজোপাঠ। পুজোপাঠ নিয়ে মেতে ওঠার বয়েস হয়নি এখনও মাইমার, হয়ত বাতের কষ্টে ধর্মেকর্মে মতি এসেছে তাড়াতাড়ি। মামা ওদিকে নিজের ব্যবসার বাইরে অন্য কোনো দিকে তাকাতে চান না। কাজের লোক, রাঁধুনিরা এত বড় বাড়ির একপ্রান্তে নিজেদের একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। দুটি প্রাণী শুধু এ-বাড়িতে বকবক করে, তারা হল অনমিত্র আর বুলটি।

অনমিত্র আর বেশিদিন নেই এখানে, ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলেই চলে যাবে নিজেদের বাড়ি বাঁকুড়ায়। কলকাতায় বছরদেড়েক ওর কেমন যেন গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে গেল। এই কলকাতার জন্য আলাদা ভাবে তেমন কোনো টান তৈরি হয়নি ওর, কিন্তু আজ ওই মুহূর্তে মনে হল কলকাতা ছাড়া ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। এই কলকাতার সঙ্গে এখন যেন প্রবাসী অনসূয়া কী অদ্ভুত ভাবে জড়িয়ে গেছে।

সকাল ছটায় অনমিত্রর খাটের পাশের টেবিলে এক কাপ চা রেখে যায় রাঁধুনি। ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে চা খেতে ওর বিচ্ছিরি লাগে। এই অভ্যেসটা ওর বাঁকুড়ার বাড়িতে একেবারেই ছিল না, কিন্তু এখানে আসার পর থেকে আস্তে আস্তে হয়েছে। একদম প্রথমদিকে ভেবেছিল, রাঁধুনিকে বলে দেবে চা দেবার দরকার নেই। কিন্তু 'না' করতে গিয়েও পারেনি। হঠাৎই একটা জেদ চেপে গিয়েছিল, দোষগুণ সমেত কলকাতাকে ও আঁকড়ে ধরবে। আঁকড়ে ধরেছেও অনেকখানি।

কালো কফিতে চমুক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাকে ও টেনে আনতে পারে কফি-হাউসের ছাতের নীচে। তবে ক্রমশ ও বুঝতে পারছিল, এ-সবের অনেকখানিই বানানো। কলকাতা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারছে না। কালো কফি কিংবা বেড-টি নিছকই বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার। এগুলো অক্লেশে ছেড়ে দিয়ে বাঁকুড়ার পুরনো জীবনে ফিরে যাওয়া ওর পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু সবকিছু কেমন যেন

গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছে কলকাতার বুকে ভেসে-আসা একটি মেয়ে।

মেয়েটি সচ্ছন্দে ইংল্যাণ্ডে থাকতে পারত, নিদেনপক্ষে ওর বাপের বাড়ি এলাহাবাদে। আর কলকাতায় আসার পরে ও বুলটির বন্ধু নাও হতে পারত! কিংবা বন্ধু হবার পরে এ বাড়িতে নাও আসতে পারত ও। সবাই তো আর সব বন্ধুর বাড়িতে যায় না।

টেবিলের ওপর বেড-টি ঠাণ্ডা হচ্ছিল আস্তে আস্তে। অনমিত্র শুয়ে ছিল চুপচাপ। খোলা জানলা দিয়ে ভোরের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় অনমিত্র ভাববার চেষ্টা করছিল, প্রেম কী? প্রেমে পড়ার লক্ষণ কাকে বলে? প্রেম কি সত্যিই যুক্তি-বুদ্ধি-নীতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে? ওর চোখের সামনে ভোরের নরম আলো চড়া হয়ে উঠল ধীরে ধীরে, কিন্তু ওইসব কঠিন প্রশ্নের একটারও মনোমত উত্তর খুঁজে পেল না ও।

চায়ের কাপের পাশে অনসূয়ার পাঠানো বইটা পড়ে আছে। বইটা কী বই এখনও ও জানে না। কাল বইটার অনেকগুলো পাতা ও উলটেছে, কিন্তু কী বই দেখা হয়ে ওঠেনি। আসলে বইয়ের মধ্যে ও অন্য জিনিস খুঁজেছিল। অনসূয়া তো ওকে একটা চিঠি লিখতে পারত! লিখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। লিখতে পারত 'স্বপ্নের খেলা' কেমন লেগেছে, লিখতে পারত…

বুকের গভীর থেকে নিশ্বাস টেনে নিয়ে এসে বাতাসে ভাসিয়ে দিল ও। তারপর আলগোছে হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে বইটা তুলে নিল। বইটার নাম 'হিটলারের শেষ জীবন'। হিটলারের শুধু শেষ জীবন নয়, গোটা জীবনটাই খুব ভালভাবে জানা আছে ওর। তবু আস্তে আস্তে বইটার পাতা উলটে যেতে লাগল ও, মাঝেমধ্যে দু-একটা চ্যাপটার পড়েও ফেলছিল। পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট যে মানুষটা হতে চেয়েছিল তার শেষ জীবনটা খুবই করুণ। করুণ অথচ রোমাঞ্চকর। অনমিত্র ভাববার চেষ্টা করল, হিটলার আত্মহত্যা করতে না পেরে শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছে। এমন হওয়া তো অসম্ভব ছিল না, আর সত্যিই যদি তাই হত? রুদ্ধশ্বাস ঘটনার আরো একটি পরিচ্ছেদ লেখা হত ইতিহাসে। কী হতে পারত সেই সেটা…

হতে-পারত ঘটনাগুলো বানাবার মুখে বুলটি ঘরে ঢুকে বলল "এ কী, তুমি এখনো শুয়ে আছ? আজ কলেজ যাবে না?"

হিটলারের জার্মানি থেকে ফিরে আসতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল অনমিত্রর। তারপর ও লম্বা একটা হাই তুলে বলল, "কটা বাজে রে এখন?"

"সাড়ে-আটটা বেজে গেছে।"

পাশ ফিরে অনমিত্র ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, "বাজুক।"

ঠাণ্ডা-হয়ে-যাওয়া চায়ের দিকে এবার চোখ পড়ল বুলটির। "চা খাওনি? আর এক কাপ দিতে বলব?"

"উহুঁ।" হিটলারের শেষ জীবনের দিকে আবার তাকাল অনমিত্র।

"কী বই পড়ছ? অনসূয়ার দেওয়া বইটা, না?"

"হুঁ। কী বই এটা দেখেছিস তুই?"

"পাগল! বই দেখলেই আমার অ্যালার্জি হয়।"

অনমিত্র এবার একলাফে উঠে বসে বলল, "সত্যিই তুই দেখিসনি?"

বুলটি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "পড়ার বইই ছুঁতে ইচ্ছে করে না আমার, তার ওপর আবার বাইরের বই।"

ওর চোখে চোখ রেখে অনমিত্র যেন আসল কথাটা জানতে চাইছিল। বুলটির বই-পড়া না-পড়া নিয়ে ওর কোনোরকম মাথাব্যথা নেই, কিন্তু এ বইগুলো কি ও সত্যিই উলটে-পালটে দেখেনি? দেখলে বইয়ের মধ্যে লুকনো চিঠিও ওর চোখে পড়েছে। আর, পরের চিঠি হাতে এলে বুলটি কি আর না পড়ে ছাড়বে? ওর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে অনমিত্র জিজ্ঞেস করল, "এটা কী বই বল তো?"

ঠোঁট উলটে বুলটি বলল, "জানি না, জানার কোনোরকম আগ্রহও নেই আমার। ও ভাল কথা আজ টিভিতে একটা দারুণ সিনেমা দেখাবে, কী বই জানো?"

অনমিত্র ভারিক্কি চালে দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, "জানি না, জানার কোনোরকম আগ্রহও নেই।"

ওর কথা শুনে বুলটি রিনরিনে গলায় ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল।

কলেজে যাওয়ার পথে অনমিত্র ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করেছিল, রাত আটটার আগে ও বাড়ি ফিরবে না। ওর কেমন যেন একটা বদ্ধ ধারণা হয়েছিল, আজ বিকেলে বুলটির সঙ্গে অনসূয়া এ বাড়িতে আসবেই। এসে অপেক্ষা করবে ওর জন্যে। করুক, শেষ পর্যন্ত দেখা না পেয়েই ফিরে যেতে হবে ওকে।

ক্লাস-লেকচারগুলো অনমিত্রর কানের পাশ দিয়ে ভেসে গেল, মাথায় ঢুকল না একবিন্দুও। ক্লাসের শেষে কফি-হাউসের জমাটি আড্ডাতেও ওর মন বসছিল না। মাঝেমধ্যেই ইচ্ছে করছিল ছুটে বাড়ি চলে যেতে। কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বলে কথা। অনসূয়া ওর জন্যে অপেক্ষা করে করে চলে যাক, তারপর ও ফিরবে।

আটটার পরে বাড়ি ফিরল অনমিত্র। চুপচাপ, নিস্তরঙ্গ বাড়ি—কাজের লোকরা বোধহয় পায়ের নীচে বেড়ালের থাবা লাগিয়ে ঘোরাফেরা করে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মামা, মাইমা আর বুলটি যে যার ঘরে। বাড়িতে পা দিয়েই অনমিত্র অপরিচিত গন্ধের খোঁজ করল। কিছু-কিছু গন্ধ আছে বাতাসে যেগুলো বহুক্ষণ ভেসে থাকে। ঘ্রাণশক্তিকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাবার পরে অনমিত্রর মনে হল, ক্ষীণ হলেও সেইরকম একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

বুলটি ওর ঘরে নিচু ভল্যুমে ক্যাসেট-প্লেয়ার চালিয়ে দিয়ে নখে রঙ লাগাচ্ছিল। অনমিত্র ওর ঘরে ঢুকে ড্রেসিং-টেবিলটার সামনের ছোট্ট টুলটায় বসে পড়ে বলল, "কী রে?"

অনমিত্র ভীষণভাবে আশা করেছিল সামান্য এই প্রশ্নটা শুনেই কথার খই ফোটাতে শুরু করে দেবে বুলটি। কিন্তু ও একটাও কথা না বলে আগের মতোই মন দিয়ে নখে রঙ করে যেতে লাগল।

রীতিমত দমে গেল অনমিত্র। কয়েক মুহূর্ত পরে জিজ্ঞেস করল, "কখন ফিরলি কলেজ থেকে?"

"বিকেলে।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কী!" মুখ না তুলেই বলল বুলটি।

অনমিত্র কথা চালাবার মতো আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেল। ক্যাসেটে কাঁদতে-কাঁদতে হিন্দি ভাষায় একটা মেয়ে গান গেয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ অনমিত্র বলল, "টিভির সিনেমাটা কেমন ছিল রে?"

"টি ভির কথা আর বোলো না তো, ওটা ভেঙে দিতে ইচ্ছে করছিল আজ।"

"কেন, পাওয়ার-কাট?"

"পাওয়ার-কাট হলে তো বলার কিছু ছিল না, ট্রান্সমিশনে গোলমাল। এই এক ঢঙ হয়েছে আজকাল।"

"অর্ধেক দেখাবার পরেই গেল?"

"না না তার আগেই গেছে, আর বেছে-বেছে এমন একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় গেল না—।" প্রায় হায়-হায় করে উঠল বুলটি।

অনমিত্র যা জানতে চায় তার কিছুই ও এখনও জানতে পারেনি। কিন্তু কাঁহাতক আর কৌতূহল চেপে রাখা যায়! দুম করে বলে বসল, "একা-একাই দেখছিলি টিভি?"

অদ্ভুত প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলল বুলটি। "একা-একাই তো দেখি।"

"কেন তোর বন্ধু, তোর বন্ধুর ইন্টারেস্ট নেই সিনেমায়?"

"কোন্ বন্ধু?"

সামান্য একটু থতমত খেয়ে গিয়ে অনমিত্র বলল, "কেন, অনসূয়া?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে বুলটি বলল, "ওর সঙ্গে আজ আমার খুব ঝগড়া হয়ে গেছে।"

"সে কী রে! প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল?"

"প্রাণের বন্ধু না কচু।"

অনমিত্র বুঝল বুলটি খুব চটে গিয়েছে অনসূয়ার ওপর। কিন্তু আসল কথাটা ও জানতে পারেনি এখনও, সেটা জানবার জন্যে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় বসে ঝগড়া করলি, বাড়িতে?"

"বাড়িতে কেন, কলেজেই। ক্লাস শেষ হবার পরে ওর সঙ্গে একটাও কথা বলিনি।"

বুলুটির কথা শুনে অনমিত্রর বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল।

প্রিয়জনকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আছে। সেই আনন্দটা আজ পেতে চেয়েছিল অনমিত্র। ভেবেছিল, বাড়ি এলেই বুলুটি বলবে: তুমি আজ এত দেরি করলে কেন? অনু এতক্ষণ বসে বসে চলে গেল। অনমিত্র যা-যা ভেবেছিল তার ধারেকাছে দিয়েও কিছু ঘটেনি। আস্তে আস্তে ছেলে-মানুষি এক অভিমান ছড়িয়ে পড়ল ওর বুকের মধ্যে।

নখে রঙ লাগাতে লাগাতে বুলুটি কেমন যেন নিজের মনে ঝগড়া করার ঢঙে বলল, "অদ্ভুত মেয়ে, কার সঙ্গে মিশব তাও যেন ও ঠিক করে দেবে।"

ঝগড়ার কারণটা এমনই অদ্ভুত যে অনমিত্র মনোযোগ না দিয়ে পারল না। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

উত্তরে কিছুটা ঝাঁঝিয়ে উঠে বুলুটি বলল, "বেথুন থেকে শর্মিলা বলে একটা মেয়ে ট্রান্সফার নিয়ে আমাদের ক্লাসে এসেছে। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। অনসূয়া হঠাৎ আজ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, তুই ওর সঙ্গে মিশবি না।"

অভিমান কেটে গিয়ে একটা কৌতূহল তৈরি হল অনমিত্রর মধ্যে। "সে কী রে! মেয়েটার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে অনসূয়ার?"

"না না, ওদের মধ্যে অনেকদিনের চেনা। শর্মিলা এলাহাবাদের মেয়ে, অনসূয়ার বাড়ির সবাইকে চেনে ও।"

"তাই নাকি, তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখ ওদের মধ্যে নির্ঘাত পুরনো কোনো ঝগড়া আছে।"

"ঝগড়া থাকলে অত গলাগলি করত না। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজনের সে কী গল্প! গল্প ফুরোতেই চায় না। অনসূয়াই তো শর্মিলার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। খুব ভাল মেয়ে শর্মিলা, যা মজার-মজার কথা বলে না! একদিনেই ওর সঙ্গে আমার দারুণ ভাব হয়ে গেছে। কিন্তু ও যেই না আজ কমনরুম থেকে বাইরে গেছে অমনি অনসূয়া মুখ গোমড়া করে বলল, তুই ওর সঙ্গে মিশবি না তো। আমি বললাম, কেন? তাই শুনে ও দুম্ করে রেগে গিয়ে বলল, তোকে মিশতে বারণ করছি—তুই মিশবি না। ওর কথা শুনে আমার যা রাগ হয়ে গেল না। বললাম, তুই আমার অভিভাবক নাকি যে তোর কথা শুনে চলতে হবে আমাকে! তারপর থেকে অনসূয়ার সঙ্গে আমি আর একটা কথাও বলিনি।"

ঝগড়ার বৃত্তান্ত শুনে অনমিত্র হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "তোরা দুজনেই একেবারে ছেলেমানুষ, কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়ে যা তো

আবার।”

বুলটি এর উত্তরে ওর কাঁধ-পর্যন্ত-ছাঁটা চুলে চিরুনি চালাতে লাগল জোরে জোরে।

॥ ছয় ॥

বুলটি আর অনসূয়ার ঝগড়া মিটে গেল পরদিন। তবে এ ঝগড়ায় জিত হয়েছে বুলটিরই। দুজনের এই ভাব হওয়ার বিনিময়ে শর্মিলার সঙ্গে ওর মেলামেশা বন্ধ হবে না। শর্মিলার সঙ্গে বুলটি যেমন মিশছিল তেমনই মিশবে।

ভাব হওয়ার তিনদিন বাদে অনসূয়া বুলটির সঙ্গে আবার বুলটিদের বাড়িতে এসে হাজির হল। অনমিত্র এ ক'দিন বিকেল হতে না হতেই বাড়ি ফিরে এসেছে, কিন্তু ফিরে এসে নিজের অভিমানের পাহাড় আরো বড় করে তোলা ছাড়া আর কোনো কাজ হয়নি ওর। আজ অনসূয়াকে দেখামাত্র সেই পাহাড়টা একফুঁয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বুকের কাঁপুনি বুকের মধ্যে শক্ত করে চেপে রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে অনমিত্র বলল, “কী ব্যাপার, তুমি আমাকে বইটই পড়ানো ছেড়ে দিলে?”

একটু হেসে উত্তর দিল অনসূয়া, “হিটলারের জীবনীটা পড়া হয়ে গেছে আপনার।”

“কবে!”

“এত তাড়াতাড়ি শেষ করলে আপনাকে বই যোগান দেব কী করে?”

“কী করব বলো? তাড়াতাড়ি পড়া অভ্যেস করে ফেলেছি, এ-অভ্যেস এখন ছাড়া মুশকিল।”

অনসূয়া চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, “সব কিছু অত তাড়াতাড়ি ভাল না।”

কথাটা শুনে ধক্ করে উঠল অনমিত্রর বুক। মনে হল অনসূয়ার কথার মধ্যে আর একটা কথা আছে। কী সেই কথা?

বুলটি বন্ধুকে বলল, “জানিস তো দাদা রাত জেগে গল্পের বই পড়ে। এদিকে উঠতে উঠতে নটা বেজে যায়।”

অনমিত্র হেসে উঠল। “নুনা আমি খুব ভোরে উঠি। তবে ভোরে উঠে ঘুমিয়ে পড়ি আবার।”

ওর কথায় বুলটি আর অনসূয়া দুজনেই হেসে উঠল, তবে অনসূয়ার হাসিটা নিবে গেল দপ্ করে। অনমিত্রর মনে হল, অনসূয়া আর একটু বেশি হাসলে পারত।

হিটলারের জীবনীটা সযত্নে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে অনসূয়া বলল, "পারলে কাল আপনাকে একটা বই দেব।"

সন্ধের আগেই অনসূয়া উঠে পড়ল। ওকে বাসস্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল বুলটি। ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই অনসূয়ার শেষ কথাটা বিশ্লেষণ করতে বসে গেল অনমিত্র। কাল একটা বই দেব মানে কী? বইটা কী ও পাঠিয়ে দেবে? না কি নিয়ে আসবে সঙ্গে করে?

বন্ধুকে বাসে তুলে দিয়ে এসে বুলটি বলল, "অনুর আজকাল কী হয়েছে কে জানে! খালি বলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এলাহাবাদে ফিরে যাবে।"

অবাক হয়ে অনমিত্র জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"কেন-টেন কিছুই বলে না, তবে আজকাল ও সব সময়ই খুব মনমরা হয়ে থাকে।"

অনসূয়ার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল অনমিত্রর। ওকে সত্যিই আজ কেমন যেন ম্লান দেখাচ্ছিল। হাসিখুশি ঝলমলে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ের হঠাৎ এরকম ঝিমিয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে বসে গেল ও। তবে কি···কিন্তু এই অনুসন্ধান কোথাও ওকে পৌঁছে দিতে পারল না।

পরদিন বিকেলে বুলটির হাতে আর একটা বই পাঠিয়ে দিল অনসূয়া। বইটা দেখেই রাজ্যের অসম্ভব চিন্তার ঝড় বয়ে গেল অনমিত্রর মাথার মধ্যে। বইটা হাতে নিয়ে ও সোজা চলে এল নিজের ঘরে। তারপর কাঁপা-কাঁপা হাতে পাতা ওলটাতেই একটা চিঠি পেয়ে গেল বইয়ের মধ্যে। খামের ওপরে অনসূয়ার নাম-ঠিকানা লেখা। চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বইয়ের পাতাগুলো আরো একবার উলটে গেল ও। সেই অসম্ভব আশা আবার ওকে কেমন যেন চেপে ধরেছিল, অনসূয়া তো ওকে একটা চিঠি লিখতে পারে! কিন্তু না, এই চিঠিটা ছাড়া আর কোনো কাগজের টুকরো নেই বইয়ের মধ্যে।

রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ল ও। তারপর চিঠিটা খুলে ফেলল আস্তে আস্তে। ওর ছোট বোনের চিঠি, লিখেছে দার্জিলিং থেকে। সবে পাকতে শুরু করেছে এমন ধরনের হাতের লেখা। এক জায়গায় লিখেছে, দিদি, গত রোববার আমরা টুংয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। দারুণ জমেছিল। তোমার কথা মনে পড়ছিল বারবার। মনে পড়ে, গত বছর সবাই মিলে আমরা পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। এবার শীতের ছুটিতে এলাহাবাদে ফিরলে আবার আমরা পিকনিক করতে যাব। বাবা তোমার কথা সবচাইতে বেশি শোনে, বাবাকে রাজি করাবার ভার কিন্তু তোমার। পুনশ্চ: আমি সোয়েটার বুনতে শিখে গিয়েছি। তুমি আমার জন্যে একটা ডিজাইনের বই কিনে রাখবে। চিঠির দু-জায়গায় মণিদীপা নামটা লেখা আছে। মণিদীপার চিঠিটা আবার খামে ভরে থার্ডক্লাস উপন্যাসটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল অনমিত্র।

অনসূয়া কেন বারবার বাড়ির লোকদের চিঠি পড়াচ্ছে ওকে ! কী লাভ চিঠি পড়িয়ে ? অনসূয়া খুব সুখী, ওর বাড়ির লোকদের মতো ভাল লোক আর হয় না, ওর বরের মতো হৃদয়বান ইত্যাদি ইত্যাদি—সামান্য পরিচিত একজনকে এ-সব কথা জানিয়ে কী আনন্দ পায় ও ? সম্পূর্ণ অকারণে আত্মপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। ক্রমাগত নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের ঢাক পিটিয়ে যাওয়া আর যাই হোক স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। অনসূয়ার ওপর ভীষণ চটে যাওয়ার চেষ্টা করল অনমিত্র, কিন্তু পারল না। মেয়েটি তার চোখ, মুখ, হাসি, কথা দিয়ে কী ভাবে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে। অনমিত্রর এই বাইশ বছরের জীবনে আর কেউ কখনো ওকে এভাবে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এই আচ্ছন্নতার পরিণাম সুখের নয় ও জানে, কিন্তু জানার পরেও আগের জায়গায় আসতে পারছিল না। ফেরার পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে অদ্ভুত উপায়ে। অথচ এগোবার রাস্তাও হয়ত আর নেই। ওর বুকের মধ্যে যখন ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যায় তখন অনসূয়া কেমন যেন পাথরের মতো হয়ে থাকে, কিংবা এমন কথা তোলে যার সত্যিই কোনো দরকার নেই।

অনসূয়া আগের মতোই একটার পর একটা বই পাঠিয়ে যাচ্ছিল, আর সব বইয়ের মধ্যেই একটা করে চিঠি—হয় ওর বাবার নয় মা'র কিংবা ছোট ভাই-বোনদের। চিঠিগুলোর আর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না অনমিত্রর কাছে। থাকার কথাও নয়। পড়ে পড়ে পরের চিঠি কত আর পড়া যায় !

একদিন দেখে একটা উপন্যাসের মধ্যে সেই প্রথম চিঠিটা ফিরে এসেছে আবার। অনসূয়ার বাবার লেখা লম্বা চিঠি। চিঠির প্রথম দু-পাতা বর্ষা নিয়ে কাব্য করেছেন ভদ্রলোক। চিঠিটা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ কেমন যেন একটা মজা করার ইচ্ছে পেয়ে বসল অনমিত্রকে !

পরের পরের দিন ও সেই চিঠিটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে বইটা বুলটিকে দিয়ে বলল, "দিয়ে দিস তোর বন্ধুকে, আমার পড়া হয়ে গেছে।"

আগে আগে বুলটি ছোড়দাকে এত তাড়াতাড়ি বই শেষ করতে দেখে অবাক হত এখন আর হয় না। বই নিয়ে আসা দিয়ে আসা ওর কাছে এখন নেহাতই একটি রুটিন কাজ।

বুলটি বইটা ওর ব্যাগে ঢুকিয়ে কলেজে বেরিয়ে গেলে অনমিত্র নিজের মনে কিছুক্ষণ হাসল। নিজের চিঠি ক্রমাগত অন্য লোককে পড়াবার মজা এবার টের পাবে অনসূয়া।

অনমিত্র সন্ধেয় বাড়ি ফিরতেই বুলটি বলল, "অনসূয়ার কী হয়েছে কে জানে ! আগের মতো আর কথাটথা বলে না। সব সময় কী যেন ভাবে।"

অনসূয়ার মন খারাপের কথা শুনে অনমিত্রর বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। একটু পরে বলল, "আগে তো কখনো হস্টেলে থেকে পড়াশুনো

করেনি, বোধহয় বাড়ির জন্যে ওর মন কেমন করছে, কয়েকদিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে বল্ না।"

"যাচ্ছে তো।"

কেমন যেন আঁতকে উঠে অনমিত্র জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ?"

"কোথায় আবার, ওদের বাড়িতে—এলাহাবাদে।"

"কবে ?"

"কাল।"

"কাল !"

অনমিত্র যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে খাপছাড়া ভঙ্গিতে ও জিজ্ঞেস করে বসল "কবে ফিরবে ?"

"বলছে না কিছুই পরিষ্কার করে, শর্মিলা না—।" বাকি কথাটুকু গিলে ফেলল বুলটি।

"শর্মিলা কী বলছিল ?'

"ও কিছু না বাজে—বাজে কথা— ।"

বুলটির পেটে কথা থাকে না, তাছাড়া ছোড়দার সঙ্গে ওর বেশ বন্ধুর মতো সম্পর্ক। অন্য কোনো বিষয় হলে অনমিত্র মাথা ঘামাত না কিন্তু শর্মিলার এই বাজে কথার সঙ্গে অনসূয়া জড়িয়ে আছি বলে ও চেপে ধরল বুলটিকে।

"কী বলেছে শর্মিলা ?"

"না না ওসব বাজে কথা।"

"বল না তুই।"

ছোড়দাকে বলার জন্যে ওই কথাগুলো বুলটির পেট থেকে বুকে, গলায় উঠে এসেছিল। আর একটু চাপ দিতেই ও বলল, "শর্মিলাও তো এলাহাবাদের মেয়ে—!"

"হ্যাঁ"

"পাশাপাশি পাড়ায় থাকে ওরা, ওদের দুই ফ্যামিলির মধ্যেই খুব জানা-শোনা আছে, শর্মিলা তাই নাকি অনুদের বাড়ির অনেক কথা—"

"কী কথা ?" অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল অনমিত্র।

"শর্মিলা বলছিল অনসূয়া নাকি ওর বরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছে। বরের কাছে আর যাবে না।"

অনমিত্র নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, "ঝগড়া সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই হয়, একবার ঝগড়া হয়েছে বলেই—।"

"শর্মিলা বলছিল, অনসূয়ার বর নাকি একটা ইংলিশ মেয়ের সঙ্গে থাকে,

বিলেত থেকে আর কখনোই ফিরে আসবে না।"

"শর্মিলা জানল কী করে? ও বিলেতে গিয়ে দেখে এসেছে নাকি?" কেমন যেন চটে গিয়ে প্রশ্ন করল অনমিত্র।

"বার্মিংহামে শর্মিলার এক দাদা থাকে, সেই নাকি জানিয়েছে।"

"বাজে কথা।"

"আমারও তাই মনে হয়, তেমন কিছু হলে শর্মিলা আভাসে-ইঙ্গিতে একটু-আধটু আমাকে নিশ্চয়ই জানাত! ওর সঙ্গে আমার তো সব কথাই হয়।"

বিলেতের ওই অরসিক ডাক্তারটার ওপর অনমিত্র এমনিতেই চটে ছিল, অনসূয়ার মতো মেয়েকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে এবার আরও চটে গেল লোকটার ওপর। কিন্তু লোকটাকে গালাগালি দিতে গিয়েও চুপ করে গেল ও।

বুলটির গোপন কথার দরজা খুলে গিয়েছিল। ও কেমন যেন ছটফটে ভঙ্গিতে বলল, "শর্মিলাটা সত্যিই খুব বাজে কথা বলে। এই জন্যেই বোধহয় অনু ওর সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিল আমাকে।"

সায় দিল অনমিত্র—"ঠিকই।"

উত্তেজিত হয়ে বুলটি বলল, "আরও সব খারাপ-খারাপ কথা বলেছে শর্মিলা।"

"আর কী বলেছে?"

"ওর বাবার সম্পর্কে।"

"বাবার সম্পর্কে!" অবাক হল অনমিত্র। "কী বলেছে?"

ছোড়দার সঙ্গে অক্লেশে প্রায় সব নিয়েই কথা বলে বুলটি, কিন্তু এটা নিয়ে বলতে ওর বাধো-বাধো ঠেকছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ও কেমন যেন ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, "অনসূয়ার বাবার সঙ্গে ওঁদের অফিসের একটা মেয়ের নাকি ভাব আছে।"

শুনে অনমিত্র রেগে গেল। "মেয়েটা সত্যিই বাজে, তুই ওর সঙ্গে মিশিস না তো।" আর একটু হলেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাবার সঙ্গে সম্পর্ক যে কত ভাল তার প্রমাণ আছে আমার কাছে। যার পারিবারিক সম্পর্ক এত ভাল সে কেন অন্য মেয়ের কাছে যাবে? তাছাড়া ভদ্রলোকের বয়েসও তো হয়েছে, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষ ওইরকম যা-তা একটা কাণ্ড করে বসতে পারে না কখনোই।

বুলটি আর একবার দম নিয়ে বলল, "অনুর বাবা নাকি আজকাল প্রায়ই বাড়ি ফেরে না।"

ধমকে উঠল অনমিত্র—"চুপ কর তো। এসব আজেবাজে কথা তুই আর কক্ষনো বলবি না আমাকে। মেয়েটা সত্যিই বাজে টাইপের, তুই ওর সঙ্গে মিশবি না।"

এর পর দুজনের কেউই আর অনেকক্ষণ কথা বলল না। চমৎকার পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠেছিল। অনসূয়াদের বাড়ির লোকদের সম্পর্কে আজেবাজে কথাগুলো রীতিমত খারাপ লেগেছিল অনমিত্রর, কিন্তু এখন ও অন্য একটা কথা ভেবে হতাশ হয়ে পড়ল। কালকেই চলে যাচ্ছে অনসূয়া! বুলটি বলেছে কয়েকদিন ধরেই অনসূয়া ট্রাভেল এজেণ্টের কাছে ঘোরাফেরা করছিল। টিকিট পেলেই ও চলে যাবে। সেই টিকিট পেয়েও গেছে। চলে যাওয়ার ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেলেছে অনসূয়া, কিন্তু কবে ফিরবে সে-সম্পর্কে বন্ধুদের কাছে কিছুই জানায়নি। এইটুকু শুধু বলেছে, পড়াশুনো ওর ভাল লাগছে না, কলকাতাও ভাল লাগছে না। ও যদি আর কখনোই এখানে ফিরে না আসে! ফিরে না আসার কারণ নির্ঘাত ওই শর্মিলা, মেয়েটা সত্যিই খুব খারাপ। খারাপ না হলে নিজের বন্ধুর সম্পর্কে এত খারাপ-খারাপ কথা কেউ বলতে পারে! অচেনা-অজানা মেয়েটাকে মনে মনে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিল অনমিত্র।

॥ সাত ॥

রাতের দিকে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শীত-শীত হাওয়া ছেড়েছে বেশ। আকাশ এখনও মেঘলা, যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে আবার। কিছুক্ষণ হল ঘুম ভেঙে গেছে অনমিত্রর, কিন্তু এখনও বিছানা ছাড়েনি। কটা বাজে এখন? বালিশের নীচে হাতঘড়িটা আছে, সঠিক সময় জানার কোনরকম আগ্রহ বোধ করছিল না ও। মেঘলা আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে হঠাৎ মনে হল, সময় হয়তো থেমে আছে। সময় কি থেমে যেতে পারে না? এরপর শুধুই হয়তো একটা অনন্ত সকাল।

সময়কে থামিয়ে দেবার উদ্ভট চিন্তাটা মাথায় খেলে যেতেই অনমিত্রর আর একবার মনে হল, অনসূয়া আজ চলে যাবে। কলকাতা থেকে এলাহাবাদের দূরত্ব কম নয়। সেই এলাহাবাদ থেকে ও যদি আর কখনোই ফিরে না আসে!

বোকা মেয়ে নয় অনসূয়া, ও হয়তো কোনো ভাবে জেনে গেছে শর্মিলা ওর সম্পর্কে আজেবাজে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। এ-সব ব্যাপারে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের কৌতূহল ঢের বেশি, হয়ত ঠোঁটকাটা গোছের কোনো মেয়ে ওকে খোলাখুলিভাবে কিছু জিজ্ঞেস করেই বসেছে। উত্তরে ও কী বলতে পারে? রাগে-দুঃখে-অপমানে ও হয়ত কেঁদে ফেলেছে। সেই কান্না আর পাঁচটা বাজে মেয়ের কৌতূহল মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়ে তুলেছে নির্ঘাত।

মেঘলা আকাশ থম্ মেরে আছে তখন থেকে। আজ বোধহয় আর রোদ উঠবে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনমিত্রর বুকের ভেতরটা

কেঁপে উঠল সামান্য ! শর্মিলার কথাগুলোর মধ্যে যদি কিছুটা সত্যি থাকে ?

থাকতেই পারে, কিন্তু এ-ব্যাপারে অনসূয়ার কী দোষ ! অবিবেচক স্বামী কিংবা দায়িত্বজ্ঞানহীন বাবার দোষের ভাগী ও কেন হবে ? ধরা যাক ওর বরের স্বভাব খারাপ কিংবা এক মেমসাহেবের খপ্পরে পড়ে বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছে। আর ওর বাবার ব্যাপারটা নেহাতই একটা আচমকা পদস্খলন। সারা জীবন সুন্দর ভাবে কাটাবার পরে একটা মানুষের পা পিছলে গেছে হঠাৎই। কিন্তু তার জন্যে তার নির্দোষ, নিষ্পাপ মেয়েকে সমালোচনার সামনে দাঁড়াতে হবে কেন ?

অনসূয়ার জন্যে গভীর সহানুভূতি জেগে উঠেছিল অনমিত্রের মধ্যে। খুব ইচ্ছে করছিল ওর হাতদুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, তুমি এসব নিয়ে একদম ভেবো না তো। বাজে লোকদের বাজে কথায় কান দিতে নেই কখনো। আর সত্যিই যদি কোনো অসুবিধেয় পড়ো আমি তো আছিই। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি, তোমার জন্যে সব করতে পারি আমি—সব।

অনমিত্র টের পাচ্ছিল ওর গলার ভেতরটা অসম্ভব ভার-ভার হয়ে উঠেছে। এটা কি ভালবাসার কোনো লক্ষণ ? ভালবাসার মানুষের কথা ভাবতে গেলে হৃদস্পন্দনের গতি কি দ্রুত হয়, গলা ভার হয়ে আসে কি ?

আকাশ আগের মতোই থমথমে। এর আগে আর কখনো আকাশকে ওর এত কাছের বলে মনে হয়নি। মৃদু শীতের হাওয়া জলকণাসমেত ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকছিল। এনন সময় রাঁধুনি ঠুক্ করে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে গেল পাশের টেবিলের ওপর।

চায়ের কাপ দেখে অনমিত্র বুঝতে পারল আজ ওর অনেক ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে। তারপরেই মনে পড়ল কাল রাত্তিরে ঘুমিয়েছেও অনেক দেরিতে। ও একটু ঘুমকাতুরে স্বভাবের কিন্তু সেই স্বভাবটা এই মুহূর্তে একটুও কাজ করছিল না। চোখের ধারেকাছে একবিন্দুও ঘুম নেই।

ভোরের চায়ের ওপর বিতৃষ্ণা ওর বরাবরের। কিন্তু আজ ও ঝুঁকে পড়ে এক চুমুকে অনেকটা চা খেয়ে ফেলল তারপর আবার, আবার। তার পরেই টের পেল আসলে ওর জল তেষ্টা পেয়েছিল ভীষণ। জলের বিকল্প হিসেবে চাটা খাওয়ার পরে স্বস্তি বোধ করল কিছুটা।

তীব্র ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেও অনমিত্র সময়টাকে আটকে রাখতে পারল না এক জায়গায়। যথা সময়ে আকাশের ফাঁকে রুপোলি আলোর রেখা ফুটিয়ে সময় গড়াতে লাগল আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণ বাদে মেঘের আড়াল থেকে আস্ত একটা বেলা বেরিয়ে এল। অনমিত্রর হঠাৎ মনে হল একেই বোধহয় মেঘে মেঘে বেলা বেড়ে যাওয়া বলে।

সাড়ে-আটটা থেকে সাড়ে-নটা পাক্কা এক ঘণ্টা মন দিয়ে সাজগোজ করার

পরে কলেজে বেরুবার সময় বুলটি বলল, "তোমার আজ কটায় ক্লাস ?"

"দেরি আছে।"

"কটায় ?"

"দুটোয়।"

"সে কি! কটা ক্লাস হবে।"

"একটা মোটে।"

"ইশ্! এম এ পড়াটা কী মজার!" বলতে বলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল বুলটি।

বুলটি বেরিয়ে যেতেই বাড়িটা আশ্চর্য রকমের নিঝুম হয়ে গেল। মামা বেরিয়ে গেছেন আধ ঘণ্টা আগে, মাইমা নিজের ঘরে বসে সাত দফা পুজো-পাঠের দ্বিতীয় দফা শুরু করেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। পায়ের সঙ্গে বেড়ালের থাবা-বাঁধা কাজের লোকগুলো কাজকর্ম প্রায় সেরে ফেলে নিজেদের জগৎ মানে একতলার লম্বা ঘরটার দিকে পা বাড়াবার মুখে।

অনমিত্র একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের ঘরে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখের সামনে ঘরের সাদা সিলিং। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে জীবনরহস্য বোঝার চেষ্টা করে করে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল দ্রুত। এমনিতে ও একটু গোছানো স্বভাবের ছেলে, কিন্তু চোখের সামনে সিগা-রেটের লম্বা ছাই বিছানার ওপর ভেঙে পড়তেও ও গা করল না। আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। অনেক উঁচুতে একটা চিল চক্র কেটে ঘুরেই চলেছিল।

বেলা গড়াতে লাগল।

আকাশে এখন এক কুচিও মেঘ নেই। খটখটে রোদ সব জায়গায়। ভোরের সেই মেঘলা আকাশের স্মৃতি ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছে এই আকাশ। জীবন-রহস্য জানার কৌতূহল আবার চেপে ধরল অনমিত্রকে। ও-ও যদি ঠিক এইভাবে সব স্মৃতিকে মুছে দিতে পারত! পেছনে কিছু নেই সামনে কিছু নেই। কিন্তু তা বোধহয় এ জীবনে হবার নয়। পেছনের সব ছবি একসঙ্গে লাফিয়ে পড়েছিল ওর চোখের সামনে। অনসূয়ার সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়ার ছবিটাও কী উজ্জ্বল!

একবার ঘরের সাদা সিলিং আর একবার বাইরের পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকিয়ে এই ছবিগুলো মুছে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল ও। কী হবে আর একজনের মুখ মনে রেখে? কী হবে আর একজনের কথা ভেবে? ভালবাসা এক তরফে হয় না। অনসূয়া হয়তো ওকে সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখে। আর সেটাই স্বাভাবিক। অনমিত্রও নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। এ হয় না, হতেই পারে না। কিন্তু এ-সব ভাবার পরেও দুঃসহ এক আবেগ ওর সারা

বুকে ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেমানুষের মতো বলতে ইচ্ছে করছিল—আমি তো ইচ্ছে করে কিছু করিনি।

মাইমার ঘর থেকে ঘন্টা বাজার শব্দ ভেসে আসতেই ও বুঝল বেশ বেলা হয়ে গেছে। এবার উঠতে হবে। তারপর স্নান-খাওয়া তারপর কলেজ। কিন্তু নিজের ইচ্ছের ওপরেও ওর বোধহয় কোনো জোর ছিল না। ওর চারপাশ দিয়ে সময় গড়াতে লাগল আবার।

সময় নাকি অনেককিছু মুছে দিতে পারে কিন্তু তার কোনো প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব এই মুহূর্তে। নির্জন দুপুরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর দুচোখ জড়িয়ে ঘুম এল। কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি, ঘুম পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কতটা সময় কেটে গেছে অনমিত্র জানে না, কিন্তু হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ও প্রায় চমকে উঠল! চোখ খোলার পরেও পরিবেশ আর পরিস্থিতি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। খোলা দরজার কড়া নড়েই যাচ্ছিল আগের মতো! "কে?" কোনো সাড়া এল না।

অনমিত্র এবার প্রায় লাফিয়ে উঠে খাট থেকে নেমে দরজার পর্দা সরাতেই চমকে উঠল। দরজার পাশে অনসূয়া দাঁড়িয়ে আছে। নিজের চোখকে ও বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু মেয়েটি যে অনসূয়াই সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। অনসূয়া কোনোরকম ভূমিকা না করে বলল, "আমার চিঠিটা দিন।"

"কোন্ চিঠি?"

প্রশ্ন শুনে অনসূয়া কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। "কোন্ চিঠি আপনি জানেন না? বইয়ের মধ্যে যে চিঠিটা ছিল সেই চিঠিটা দিন।"

অনমিত্রর চোখ থেকে ঘুমের রেশটুকু কেটে গেছে। এই ঘটনাটার মধ্যে স্বপ্নের ছিটেফোঁটাও নেই! খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ও বলল, "বুলুটি কোথায়?"

"কলেজে।"

হাসবার চেষ্টা করল অনমিত্র। "তুমি নাকি আজকেই এলাহাবাদে চলে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ"

"হঠাৎ! ফিরবে কবে?"

অনসূয়ার মুখটা আগের মতোই থমথমে হয়ে ছিল, প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, "আমার চিঠিটা দিন।"

একেবারে সাদাসিধে মানুষের মতো চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে অনমিত্র উত্তর দিল, "কোন্ চিঠি!"

শুনে কেমন যেন খেপে গেল অনসূয়া। ওর সারা মুখ অস্বাভাবিক লাল

দেখাচ্ছিল। কী যেন বলতে গিয়ে থমকে গেল, তারপরেই বলল, "আপনি জানেন না কোন্ চিঠি? শিগ্‌গির দিয়ে দিন আমার চিঠি।"

অনমিত্র নিছক একটু মজা করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর চোখের সামনে পুরো ব্যাপারটা অন্য দিকে ঘুরে যেতে দেখে বলল, "সত্যি, আমি বুঝতে পারছি না, কোন্ চিঠির কথা বলছ তুমি!"

অনসূয়ার লালচে মুখ ফেটে এক্ষুনি বোধহয় রক্ত বেরিয়ে পড়বে। ও কোনোমতে বলল, "কয়েকদিন আগে আপনাকে যে বইটা পড়তে দিয়েছিলাম, আপনি বলতে চান তার মধ্যে কেনো চিঠি ছিল না?"

অনমিত্র পরিষ্কার বুঝতে পারল ওর আর ফেরার পথ নেই।

" না, ওর মধ্যে তো কোনো চিঠি পাইনি!"

"আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।"

"ন্না বিশ্বাস করো…।"

"না আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।" অনসূয়ার চোখের মধ্যে জল টলটল করে উঠল।

অনমিত্রর ইচ্ছে করছিল হাতটা ধরে ওকে ঘরের মধ্যে এনে বসায়। তারপর না হয় ও একটু শান্ত হবার পরে চিঠিটা দিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু সে সুযোগ ওকে দিল না অনসূয়া। একেবারে ছেলেমানুষের মতো বলে উঠল, "চিঠিটা দেবেন কি দেবেন না?"

আর একবার হাসবার চেষ্টা করে অনমিত্র বলল, "তুমি ভেতরে এসে বোসো তো।"

কেমন যেন মরিয়া হয়ে গিয়েছিল অনসূয়া। "চিঠিটা দেবেন না তাহলে?"

"আরে! কী আশ্চর্য! থাকলে তো…!"

কথাটা ওকে শেষ করার সুযোগ দিল না অনসূয়া, "ঠিক আছে" বলেই হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

পুরো ঘটনাটাই আকস্মিক আর এত দ্রুত ঘটে গেল যে অনমিত্র কেমন যেন পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল। এখন কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারল না। ওর চোখ-মন আর হাত-পায়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল না বোধহয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওর মনে হল এক্ষুনি গিয়ে অনসূয়াকে আটকানো উচিত। কিন্তু এ-কথা মনে হওয়ার পরেও হাত-পা ওর বশে এল না। যখন এল তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে। পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে বাসস্টপে ছুটে গিয়ে দেখল অনসূয়া নেই। এ-সময় বাসস্টপে খুব একটা ভিড় থাকে না। অল্প কয়েকজন যাত্রী এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভুল করার কোনো উপায় নেই, তবুও কেমন যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারদিক দেখল। না, অনসূয়ার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো বাস

পেয়ে গেছে !

ও যে চলে গেছে এ-ব্যাপারে আর কোনো সংশয় নেই। এটা বুঝতে পারার পরে অনমিত্রর বুকের ভেতরটা হায়-হায় করে উঠল। কী দরকার ছিল রহস্য করার? ও তো সরাসরি বলতে পারত, হ্যাঁ চিঠিটা আমার কাছে আছে, এই নাও। বই পড়তে গিয়ে চিঠিটা চোখে পড়েছিল, সরিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম বইটা ফেরত দেবার সময় দিয়ে দেব! কথাগুলো প্রথমে না বলুক, শেষেও তো বলতে পারত। কিন্তু কোত্থেকে কী যে হয়ে গেল! আসলে, কথার পিঠে কথা পড়তেই পুরো ব্যাপারটা বিশ্রী একটা বাঁক নিয়ে নিয়েছিল। এমন বাঁক যে সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না। তাছাড়া অনসূয়া দুম্ করে এত সেণ্টিমেন্টাল হয়ে পড়বে কে জানত!

কিন্তু এখন কী করা যায়?

কী করা যেতে পারে!

বাসস্টপে বেলা আরো বেড়ে গেল, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তেই পেঁৗছতে পারল না অনমিত্র। বেশ কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে এল ও। নিজের ঘরে ঢোকার মুখে রাঁধুনি বলল, "দাদা, আপনার ভাত দিয়ে দিই।"

কথাটা যেন না বুঝেই 'হ্যাঁ' বলে দিল অনমিত্র, তার পরেই মনে হল তার চান করা হয়নি তো আজ! কিন্তু কথা আর না বাড়াবার জন্যে চুপ করেই থাকল ও।

খাওয়ার টেবিলে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়াই হল শুধু, খাওয়া আর হল না। ওর মনে পড়েছিল অন্য জায়গায়, সেই মনটা ভাবছিল—ইশ্! আজকেই অনসূয়ার এলাহাবাদ চলে যাওয়ার কথা।

এটা মনে হওয়ার পরেই একটা তরঙ্গ খেলে গেল ওর মাথায়। এখন অনসূয়া নির্ঘাত হস্টেলেই আছে, হস্টেলে গিয়ে চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে এলেই তো হয়। ভাবনার তরঙ্গে বিদ্যুৎ ছিল বোধহয়, অনমিত্র ভাতের থালা সরিয়ে রেখে উঠে পড়ল। তারপর চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়!

অনসূয়াদের হস্টেলে ও কোনোদিন যায়নি কিন্তু যাতায়াতের পথে হস্টেলটা ওর চোখে পড়েছে বহুবার। বাসে ওঠার পরেই ভাবতে শুরু করে দিল—কী ভাবে ও চিঠির কথাটা পাড়বে। সরাসরি কথা বলার আর কোনো উপায় নেই। একটু ঘুরিয়ে বলতে হবে। বলবে টেবিলের এক কোণে চিঠিটা পড়েছিল, বই ওলটাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল হয়তো, এখন হঠাৎ চোখে পড়তেই—। এটা তো হতেই পারে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই, চিঠি ফেরত পাওয়ার পরে অনসূয়া নিশ্চয়ই ওর ব্যবহারের জন্যে লজ্জা পাবে ভীষণ। হয়তো বলবে—।

কী-কী বলতে পারে মনে মনে তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলল অনমিত্র। তারপর ভাবল এই সব কথার উত্তরে লাগসই কী-কী জবাব দেওয়া

যায় ! তবে যাই বলুক না কেন ওকে একটু গম্ভীর হওয়ার ভান করতে হবে। গম্ভীর হলে নির্ঘাত অনসূয়ার লজ্জা আর অনুতাপের মাত্রা বেড়ে যাবে। বিব্রত, লজ্জিত, পরমাসুন্দরী মেয়েটির মুখ কল্পনা করে মনে মনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল অনমিত্র।

কিন্তু হস্টেলের স্টপে নামতেই ওর বুক কেঁপে উঠল। মনে হল এতক্ষণ যা-যা ভেবেছে সে-সবের মতো অর্থহীন আর আর কিছুই হতে পারে না। চারতলা লেডিজ হস্টেলটাকে কেমন যেন অন্য জগতের মতো দেখাচ্ছিল। এই জগতে ওর বোধহয় ঢোকার কোনো অধিকার নেই।

সেকেলে ধাঁচের বিশাল বাড়িটার প্রকাণ্ড গেটটা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। এমনভাবে বাঁধা যে একটা মানুষ যাতায়াত করতে পারে কোনো মতে। গেটের ভেতরদিকে হয়ত দারোয়ান বসে আছে, আরো ভেতরে হয়ত ভিজিটরস' রুম। ওখানে গিয়ে কী বলবে ও ? মেয়েদের হস্টেলের নিয়ম কানুন নিশ্চয়ই বেশ কড়া, অনসূয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেই কি ওকে দেখা করতে দেওয়া হবে !

শেষ দুপুরের রাস্তা বেশ ফাঁকা, ওই ফাঁকা রাস্তায় লেডিজ হস্টেলের সামনে দিয়ে কয়েকবার পায়চারি করার পরেই ঘেমে উঠল অনমিত্র। মনে হল পানের দোকান, স্টেশনারি দোকান আর রাস্তাঘাটের সব লোক তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হয়তো ভাবছে—

ওদের ভাবনাগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে আরো ঘেমে উঠল অনমিত্র। দূর থেকে একটা বাস আসছিল, কোথায় যাবে কে জানে, কিন্তু এটায় উঠে এক্ষুনি সরে পড়া দরকার। হাত তুলেছিল ও, কিন্তু বাসটা গতি একটুও না কমিয়ে হুশ্ করে বেরিয়ে গেল।

এবার ?

চারিদিকে একবার দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে সাহস সঞ্চয় করল অনমিত্র। ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। লম্বা পায়ে এগিয়ে ও হঠাৎ হস্টেলের গেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে গলে গেল।

ভেতরে ঢুকে কাউকেই দেখা গেল না। সামনে এক চিলতে বাগান, বাগানের পাশেই বিশাল দরজা। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে লেডিস হস্টেলের ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না, অথচ জিজ্ঞেস করার মতো কেউ নেই ধারেকাছে। এই রকম একটা জায়গায় চুপচাপ বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও অস্বস্তিকর। ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নেব-নেব করছে ঠিক তক্ষুনি কে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কাকে চাই ?"

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেবার একটু বাদে ওদিকের নিচু ছাতের ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। এই লোকটাই বোধ হয় এই হস্টেলের দারোয়ান ! লোকটা বেশ খুঁটিয়ে অনমিত্রকে দেখে নিয়ে বলল, "কাকে চাই ?"

"অনসূয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ?"

লোকটার প্রশ্নের ধরন দেখে অনমিত্রর মনে হয়ে ছিল, অন্তত ডজনখানেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ওকে, কিন্তু লোকটা আর কিছু জিজ্ঞেস না করে ও-দিকের ঘরটার দিকে আঙুল তুলে বলল, "ভিজিটর'স রুমে যান।"

ভিজিটরস' রুমে কেউ ছিল না, অথচ সিলিংয়ে ঝোলানো পাখাটা বন-বন করে ঘুরে যাচ্ছিল! সেকেলে জাবদা হাতলওলা বেঞ্চ পাতা তিনদিকে। ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে না পেয়ে সেই লোকটার খোঁজ করল অনমিত্র, কিন্তু ও আবার কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে! অগত্যা পায়ে-পায়ে একটু এগিয়ে একটা বেঞ্চের এক ধারে বসে পড়ল অনমিত্র।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মাঝবয়সী একজন ভদ্রমহিলা ফটাশ-ফটাশ করে চটির শব্দ তুলে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ?"

খরখরে চোখের ভদ্রমহিলা বোধহয় এই হস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট। আমতা-আমতা করে অনমিত্র বলল, "আমি মানে, অনসূয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

"আপনি ওর কে হন ?"

"আমি, আসলে অনসূয়া আমার বোনের বন্ধু, ওকে একটা জিনিস দেবার জন্যে এসেছি।"

"ঠিক আছে আমার কাছে দিয়ে দিন।"

চট করে কোনো জবাব এল না অনমিত্রর মুখে। একটু থেমে বলল, "সেই সঙ্গে দু-একটা দরকারি কথা বলারও ছিল—।"

"অনসূয়ার ভিজিটরস' লিস্টে কি আপনার নাম আছে।"

"না।"

"তাহলে তো আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।" শেষ কথা বলার ঢঙে কথাটা বললেন ভদ্রমহিলা।

"একবার মানে এক মিনিটেই আমার কথা শেষ হয়ে যাবে।"

"না নিয়ম নেই।"

এর কোনো জবাব খুঁজে পেল না অনমিত্র। বুঝতে পারছিল অনুরোধ করা বৃথা। ভদ্রমহিলা চোখেমুখে একটা ব্যস্ত-ব্যস্ত ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন, "আপনার কিছু দেবার থাকলে দিয়ে যেতে পারেন।"

কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা ধাক্কা ছিল, সেই ধাক্কায় অনমিত্র বলে উঠল, "না তার আর দরকার নেই। ঠিক আছে।"

রাস্তায় ও যখন বেরিয়ে এল তখন রোদ্দুর বেশ নরম হয়ে এসেছে। রাস্তা-ঘাটে লোকজনের সংখ্যা বেড়ে গেছে বেশ। অনমিত্র বুঝতে পারছিল না এখন কী করা উচিত ওর! বুকপকেটে অনসূয়ার বাবার লেখা সেই চিঠিটা। আলতো

করে সেই চিঠিটা ছুঁয়ে দেখল অনমিত্র। একবার মনে হল চিঠিটা ওই ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে এলেই ভাল হত! কিন্তু শুধু চিঠি পৌঁছে দেওয়াই নয় ও তো আরও কিছু বলতে চায় অনসূয়াকে। সেই কথাগুলো যে কী ও এখনও ঠিক জানে না। কিন্তু কথা আছে, কথা জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে ওর বুকের মধ্যে।

আরো ঘন্টাদুয়েক উলটো-পালটা এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করার পরে বাড়ি ফিরে এল অনমিত্র। বাড়িতে ঢোকার মুখে সেই অসম্ভব ধারণাটা পেয়ে বসেছিল আর একবার। বুলটির সঙ্গে যদি অনসূয়া থাকে!

কিন্তু অসম্ভব ধারণাটা অসম্ভবই থেকে গেল, বুলটির ধারেকাছে অনসূয়ার কোনো চিহ্ন নেই। বুলটি আলমারি হাট করে শাড়ি গোছাচ্ছিল, অনমিত্রর পায়ের শব্দে পেছন ফিরে বলল, "আরে ছোড়দা, অনসূয়ার কী একটা চিঠি যেন ওর বইয়ের মধ্যে ছিল। বইটা তোমাকে দিয়েছিল ও, কিন্তু চিঠিটা···তুমি কিছু পেয়েছ নাকি ?"

অনমিত্র হুড়মুড় করে সব কথা বলে ফেলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

বুলটি একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আর একবার বলার পরে থমথমে গলায় উত্তর দিল ও, "না তো।"

"অনুটা সত্যিই পাগল! ছুটতে ছুটতে কলেজে গিয়ে বলল তোর দাদাকে যে বইটা পড়তে দিয়েছিলাম তার মধ্যে আমার একটা দরকারি চিঠি ছিল, পাচ্ছি না, জানিস কোথায় ? আমি বললাম আমি কী করে জানব! ও বলল, তাহলে তোর দাদা জানে। আমি বললাম তাহলে দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, দাদা তো বাড়িতেই আছে। আজ দেরিতে কলেজ। বলার সঙ্গে সঙ্গে ও ছুটে বেরিয়ে গেল।"

বুলটি আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল, অনমিত্র থামিয়ে দিয়ে বলল, "অনসূয়া তো এসেছিল।"

"এসেছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"কী পাগল মেয়ে দেখেছ! পেয়েছে ওর হারানো চিঠি ?"

অনমিত্র একটা ঢোক গিলে বলল, "থাকলে তো পাবে।"

বুলটি ওর চোখ আর ভুরু কপালের প্রায় মাঝখানে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করে বন্ধুর পাগলামোর গল্প জুড়ে দিল আবার।

কথাগুলো অনমিত্রর কানের পাশে ঝমঝম করে বাজছিল, কিন্তু সব কথা কানে যাচ্ছিল না। ওর মাথার মধ্যে আকাশ-পাতাল ঢুকে গিয়েছিল এক সঙ্গে। কোনো কথাই গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না। হঠাৎ বুলটির কথার মাঝখানেই বলে বসল, "অনসূয়া কি সত্যিই এলাহাবাদে চলে যাচ্ছে ?"

"হ্যাঁ যাচ্ছে তো, আজকেই।"

"কবে ফিরবে ?

"বলেছে আর ফিরবেই না।"

"সে কী রে! ওর কলেজ ?"

"ছেড়ে দেবে বলেছে।"

একজন দূরের মানুষ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যেভাবে কথা বলে ঠিক সেইরকম ভান করে অনমিত্র বলল, "তোর বন্ধুর কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে ?"

বন্ধুর জন্যে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে উত্তর দিল বুলটি, "তাই বোধহয় হয়েছে। শর্মিলার সঙ্গে ও আর কথা বলে না, আর আমি শর্মিলার সঙ্গে মিশি বলে আমার ওপরেও রেগে গেছে ভীষণ। বললাম এলাহাবাদে পেঁছেই চিঠি দিবি, বলল, দেখি। ওর ঠিকানাটা চাইলাম তাও দিল না।"

অনমিত্রর বুকপকেটে অনসূয়ার সেই চিঠিটা, ওটা হাত দিয়ে ছুঁতেই ওর মাথায় আর একটা তরঙ্গ খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ও বলল, "অনসূয়ার ট্রেন কটায় ছাড়বে রে ?"

বুলটি দুহাত দুদিকে সামান্য ছড়িয়ে দিয়ে উত্তর দিল, "তা তো জানি না।"

মাথার সেই তরঙ্গটা এখন অনমিত্রর বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখল সন্ধে নেমে গেছে কখন যেন। আর দেরি করা ঠিক হবে না!

বুলটিকে শুনিয়ে অনমিত্র নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বলল, "ওহো একটা কাজ আছে। বেরুতে হবে এক্ষুনি।" বলেই লম্বা পায়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রাস্তায় খুব একটা জ্যাম ছিল না, মোটামুটি তাড়াতাড়িই ও হাওড়া স্টেশনে পোঁছে গেল। কিন্তু আসার সময় বারবার মনে হচ্ছিল, এ পথ বোধহয় আর কখনোই শেষ হবে না।

স্টেশনে ব্যস্ত মানুষদের ছোটাছুটি, চেঁচামেচি, অথচ কী এক অলৌকিক উপায়ে নিজের বুকের দুপদাপ শব্দ আছড়ে পড়ছিল অনমিত্রর কানের ওপর।

এনক্যুয়ারিতে বেশ ভিড়, অনেক কষ্টে এলাহাবাদ যাবার ট্রেনগুলোর খবর জোগাড় করল ও। তার পরেই মনে হল, যে ট্রেনটা একটু আগেই এলাহাবাদের পথে রওনা হয়ে গেল অনসূয়া যদি সেই ট্রেনেই চলে গিয়ে থাকে!

কিন্তু পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় আর নেই, অনমিত্র বাকি ট্রেনের কামরাগুলো খুঁটিয়ে দেখার জন্যে প্লাটফর্মে ছুটল।

প্লাটফর্মে অসংখ্য যাত্রী, কামরাগুলো উপচে পড়ছে ভিড়ে। এর মধ্যে কোনো একজনকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল অনমিত্র।

প্রায় পলকহীন চোখে ট্রেন আর প্লাটফর্মের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুচোখে ব্যথা হয়ে গেল ওর। হেঁটে হেঁটে পা টনটন করছে। বুকের মধ্যে ছোট্ট হাতুড়ি কে যেন ঠুকেই যাচ্ছে সমানে।

শেষে, এলাহাবাদে যাওয়ার শেষ ট্রেনটা চলে গেল ওর চোখের সামনে দিয়ে। অনসূয়ার সঙ্গে দেখা না হওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না অনমিত্র। ছেলেমানুষি অভিমানে গলা কেমন যেন ভার-ভার হয়ে উঠেছিল ওর। কেন জানে না বারবার মনে হচ্ছিল এরকম হওয়ার তো কথা ছিল না!

স্টেশনের ভিড় এখন অনেক কমে গেছে। আগাগোড়া বিধ্বস্ত অনমিত্র পা টেনে টেনে স্টেশনের বাইরে এল, তারপর কেমন যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে হেঁটে হেঁটে হাওড়া ব্রিজের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

নীচে গঙ্গা, দূরে নানা ধরনের আলোর মালা। গঙ্গার জল ছুঁয়ে হাওয়া বোধহয় ঘূর্ণিবাতাসের মতো উঠে আসছিল আকাশে। সেই হাওয়ায় গা ভাসিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে অনমিত্রর হঠাৎ মনে হল অনসূয়ার সঙ্গে ওর দেখা হবে আবার।

শর্মিলার কথাগুলো হয়তো ঠিকই। বরের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই অনসূয়ার। ওর বাবাও হয়তো ভুল করে পারিবারিক জীবনের শেষ বন্ধনটুকু ছিঁড়ে ফেলেছে! এই অবস্থায় অনসূয়া একা, একেবারেই একা। কিন্তু ও যে সত্যিই একা নয়, সে কথাটা অনসূয়াকে জানিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করে আবার হাঁটতে শুরু করে দিল অনমিত্র।

উলটোদিক থেকে হুড়মুড় করে বাসট্রাম ছুটে আসছিল, কিন্তু অনমিত্র অদৃশ্য কারও উদ্দেশে বলল—ভয় পেয়ো না আমি আছি।